ভারতের প্রেম ও সাধনা

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর গল্পগুলিতে বর্ণিত নরনারীর চরিত্রগুলি আপন মহিমায় ভাস্বর এবং প্রতিটি গল্পে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানবমনের তথা নরনারীর অন্তরের শাশ্বত রূপ।
সাহিত্য রসসমৃদ্ধ এই গল্পগুলি মহাভারত হইতে আহৃত। মহাভারতের গল্পগুলির মূল ঘটনা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য অবিকৃত রাখিয়া প্রতি গল্পেরই নব রূপায়ন করা হইয়াছে। গল্পের নির্বাচিত চরিত্রগুলি ভাস্বর মহিমায় মণ্ডিত।—ইহা নরনারীর প্রেমকথা।

নিশীথরঞ্জন চাকী

প্রকাশক
সাহিত্যবিহার
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পরিবেশক
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১

BHARATER PREM O SADHANA

Selected short stories from Mahabharat

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৭০,

সাহিত্যবিহার-এর পক্ষে শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্য, এম. এ. কর্তৃক
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং শ্রীভূমি মুদ্রণিকা-র পক্ষে শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য কর্তৃক
৭৭ লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত

কল্যাণীয়া স্ত্রী ও কন্যাগণ
এবং কল্যাণীয় পুত্র
শ্রীমতী কমলা ও অনুরাধা, অনসূয়া, অজন্তা
এবং শ্রীমান অমিতাভর হাতে দিলাম।

সূচী

ইন্দ্র ও ভঙ্গাস্বন

রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাতায়ন পথে মেঘহীন নির্মল আকাশের দিকে উদাস ভাবে চাহিয়া আছেন নৃপতি ভঙ্গাস্বন। গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাস অবিরত হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার মুখমণ্ডল ঝলসাইয়া দিতেছে।

তাঁহার রাজ্যে বিগত দুই বৎসর পর পর অনাবৃষ্টি গিয়াছে। বর্তমান বর্ষাকালও বিগতপ্রায়। আজিও আকাশ মেঘহীন। বৃষ্টি-পাতের লক্ষণ নাই। প্রজাদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। তুষার-বিগলিত সামান্য বারিধারা শীতল হইতে পারে কিন্তু খাল বিল জলাশয় পূর্ণ করিতে পারে না। তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিতে পারে না—পারে না আতপদগ্ধ মানুষকে সান্ত্বনা দিতে। ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত প্রজাগণের আর্তনাদে মুখরিত চারিদিক।

প্রজাদিগের মুখে হাসি ফোটানো কি দুরাশা? এই অনাবৃষ্টিকে সরাইয়া মেঘের শ্যামল ঘনঘটা আনা কি অসম্ভব? না—অসম্ভব নয়। একটু নম্র হইলেই হয়তো দেবরাজ ইন্দ্র নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবেন। পর্জন্যদেবকে আদেশ দিবেন—'ধারা বর্ষণ কর'। তাঁহারই অঙ্গুলি-সংকেতে জলদ মেঘমালা এই রাজ্যকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারই নির্দেশে দেশের মাটি উষর—বন্ধুর—শস্যহীন!

কিন্তু কেন তাঁহার এই বিরূপতা? কেন অসন্তুষ্ট স্বর্গাধিপতি বাসব?

নিঃসন্তান ভঙ্গাস্বন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সব আয়োজন করিয়াছিলেন। একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্র ছাড়া সকল দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন সেই যজ্ঞে। ইন্দ্রকে অবহেলা করিয়া তাঁহার উপাস্য দেবতা অগ্নিদেবকে যজ্ঞের প্রধান পদে বৃত করেন নৃপতি। কারণ গুরুপত্নী হরণকারী দুরাচারকে তিনি আমন্ত্রণ জানাইতে চাহেন নাই। ভাবিয়াছিলেন ঐ লম্পটকে আবার পূজা! সে তো অচিন্তনীয়।

অগ্নিতুষ্ট পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলে নৃপতির শত মহিষী শত পুত্র উপহার দিয়াছেন। অগ্নিদেবতা ভরসা দিয়াছেন—পুত্রেরা রাজ্যমধ্যে

নিরাপদ, সুস্থ ও সবল রহিবে। আর নৃপতি নিজ রাজধানীর অভ্যন্তরে ইন্দ্রের কোপ হইতে মুক্ত থাকিবেন। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অনির্বাণ হোমশিখা যতদিন জ্বলিবে তাঁহার কোনো ক্ষতি করা ইন্দ্রের সাধ্য হইবে না।

কিন্তু দেবরাজ মায়াবী। তাঁহার মায়া হইতে নৃপতিকে মুক্ত রাখা অগ্নিদেবের সাধ্যাতীত। রাজধানীর ভিতরে তিনি অবশ্য সুরক্ষিত। অনির্বাণ হোমানল ইন্দ্রের সকল মায়াজাল ছিন্ন করিতে সক্ষম। কিন্তু রাজধানীর বাহিরে?

'চাই খাদ্য, চাই পানীয়'—প্রজাগণের এই আকুল আর্তনাদে বিচলিত হইয়াছেন নৃপতি। বার বার দূত পাঠাইয়াছেন দেবরাজের নিকট। কিন্তু হায়! সকলই বৃথা হইয়াছে।······একবার মাত্র অনুতাপ অথবা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জ্ঞাপন করিলেই দেবরাজ পর্জন্যদেবকে আদেশ দিবেন অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ করিতে। যাহার ফলে মাঠে ফলিবে শস্য, দুর্ভিক্ষপীড়িত তাঁহার রাজ্যে দূর হইবে জলাভাব—ঘরে ঘরে ফুটিবে প্রসন্ন হাসি।

না—না—তাহা অসম্ভব। নৃপতি ভাবেন মহাপাতকের নিকট নতিস্বীকার কখনই নয়। হউক না সে স্বর্গাধিপতি সহস্রলোচন এবং জলদ-অধিপতি বাসব—তবুও না।

নৃপতি ভঙ্গাস্বনের ঐ প্রকার কল্পনার—চিন্তার জাল সহসা ছিন্ন হইল। মনে পড়িল দুর্ভিক্ষ কবলিত অবস্থার জন্য বহুদিন তাঁহার মৃগয়ায় যাওয়া সম্ভব হয় নাই। এই মুহূর্তে বাহির জগৎ তাহার মনকে বড়ই টানিতেছে।

যদিও অগ্নিদেবতার সতর্কবাণী আছে তবুও তিনি একবার মৃগয়ায় যাইবেন স্থির করিলেন। এইরূপ মানসে তিনি একদা রাজকীয় শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন নগরী হইতে দূরে—অরণ্যানীর পথে। তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র রহিল সেনাপতি, বয়স্য ও কিছু দেহরক্ষী সৈন্য।

অরণ্যানীর অভ্যন্তরে ক্রমশঃ মৃগয়ায় মাতিয়া উঠিলেন নৃপতি ভঙ্গাস্বন। দেখিলেন একটি অপূর্ব সুন্দর মৃগ সহসা তাঁহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল। মৃগের প্রতি শরসন্ধান করিলেন তিনি। ব্যর্থ হইল। দমিলেন না তিনি। অশ্বারোহণে একাকী উহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

গতিবেগ বাড়িল নৃপতির। অরণ্য গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল উভয়ের গতিবেগ। পশ্চাদ্ধাবনে রত নৃপতি শরের পর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অব্যর্থ শরসন্ধানের একটিও মৃগকে বিদ্ধ করিল না। সহসা চোখের আড়াল হইল মৃগটি। হতচকিত ভঙ্গাস্বন ভাবিলেন—এ কি মায়ামৃগ ? নতুবা এরূপ তো অসম্ভব !

এদিকে তাঁহার অশ্ব পরিশ্রান্ত হইয়াছে। তিনি নিজেও অত্যাধিক ক্লান্ত—শ্রান্ত—পিপাসার্ত। একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। কোথায় তাহার সেনাপতি ও দেহরক্ষীর দল ! তাহাদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি একাকী মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কোথায় চলিয়াছেন নিজেই জানেন না। ওদিকে সন্ধ্যা সমাগত। এখন উপায় ?

অগ্রসরমান রাত্রি যদি গভীর হয় তবুও আকাশের নক্ষত্রখচিত নীলাঞ্চল দেখিয়া নিজের পথ নিজেই নির্দেশ করিবেন তিনি। ভয় কিসের ! হিংস্র শ্বাপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে আছে তূণীর পূর্ণ তীক্ষ্ন শর, ক্ষুরধার অসি ও ভল্ল।

চলিতে চলিতে তৃষ্ণায় কাতর হইলেন নৃপতি। কিন্তু কোথায় তৃষ্ণার জল—পিপাসায় তাহার প্রাণ যে প্রায় ওষ্ঠাগত। এমনি সময়ে সহসা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল বিহগকুলের কলকাকলি। শোনা গেল সম্মুখবর্তী বৃক্ষশাখায় পক্ষিডানার ঝটপট ধ্বনি। অকস্মাৎ একদল বলাকা উড়িয়া গেল। আশান্বিত নৃপতি ভাবিলেন নিশ্চয় নিকটে কোনো জলাশয় আছে। নিজ অশ্বকে সঙ্গে লইয়া তিনি পদব্রজে উড্ডীয়মান পক্ষিদের শব্দানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক অপূর্ব দৃশ্য তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

বিস্ফারিত চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সম্মুখেই এক দিগন্তবিস্তৃত স্বচ্ছ সরোবর। সেই সরোবরে দলে দলে মরাল মরালী ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সলিলে প্রতিবিম্বিত বৈকালিক সূর্যালোকচ্ছটা অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরে অরণ্যানীর ভিতরে প্রকৃতিদত্ত সরোবরের এই অবস্থান ইতিপূর্বে তাহার জানা ছিল না।

দুই হাত জোড় করিয়া উপাস্য অগ্নিদেবতাকে প্রণাম করিয়া রাজবেশ খুলিয়া ফেলিলেন তিনি।. এখন প্রথম প্রয়োজন অবগাহন স্নান, তারপর চতুর্দিকের অজস্র ফলবান বৃক্ষাদি হইতে পক্ক কদলী এবং রসাল ফল প্রভৃতি আহরণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ।

তাহার মুক্ত অশ্বটি সাগ্রহে জলপান করিয়া নবদূর্বাদল চর্বণ করিতে লাগিল। নৃপতি নিজের বস্ত্রসম্ভার সরোবর তটে রাখিয়া জলে নামিলেন। অবগাহন স্নানে শরীর শীতল হইল। জলপানে পিপাসা দূর হইল। পরিতৃপ্ত হৃদয়ে জল হইতে উত্থান করিয়া অকস্মাৎ স্তম্ভিত বিহ্বল হইলেন ভঙ্গাস্বন।

এ কি! তাঁহার সমগ্র দেহে একি বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিরাট পুরুষ দেহটি ক্ষীণ নারীদেহে রূপান্তরিত হইয়াছে।

নিজ দেহের এই অকল্পনীয় পরিবর্তন দেখিয়া লজ্জিত ও স্তম্ভিত নৃপতি সরোবর তটে বসিয়া পড়িলেন। স্বচ্ছ সলিলে দেখিতে লাগিলেন নিজ দেহের প্রতিবিম্ব—এক অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শ বর্ষীয়া নারীদেহ সলিলের মধ্যে মৃদু তরঙ্গাঘাতে যেন দুলিতেছে। ওদিকে সরোবর তট হইতে তাঁহার রাজকীয় বস্ত্রসম্ভার, অস্ত্র, তূণীর ইত্যাদি অপহৃত হইয়াছে। পরিবর্তে মণিমাণিক্য খচিত অলংকারাদি এবং রামধনু রং-এর বিচিত্র বস্ত্রসম্ভার পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে। অতঃপর অশ্বর দিকে চাহিলেন। সেও যেন বিস্মিত-বিপন্ন। অগ্নিদেবতার সতর্কবাণী পুনরায় স্মরণে আসিল নৃপতির—রাজধানীর বাহিরে ইন্দ্রের মায়া হইতে মুক্ত রাখা সম্ভব হইবে না।

অদৃশ্যলোক হইতে সহসা ভাসিয়া আসিল ইন্দ্রের ব্যঙ্গোক্তি—পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত মায়া সরোবরের জলপান ও অবগাহণের জন্য তোমার এই পরিবর্তন। ইন্দ্র-অবমাননার ফলভোগ কর এবার ভঙ্গাস্বন।

নিজ দেহের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে হৃদয়েরও বিপুল পরিবর্তন! সরোবর সলিলে বার বার নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া নৃপতি বিহ্বল অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন—আমি এতই অনিন্দ্যসুন্দরী! আমার কনিষ্ঠা মহিষীর চাইতেও আমি মনোরমা—মনোহরা—মধুরা!

নারীসুলভ আবেগে ভঙ্গাস্বন একে একে সকল অলংকার ও বস্ত্রসম্ভার পরিলেন। লোধ্র রেণু, শ্বেত চন্দন, কুরুবক। না—প্রসাধনের কোনো উপকরণই বাদ নাই। পরম আগ্রহে নিজেকে সজ্জিত করিলেন, সুনিপুণ হস্তে পত্রলেখায় দেহবল্লরী অংকিত করিলেন।

ওদিকে পুরুষত্ব হরণ করিয়া ক্রূর বাসব অদৃশ্যলোক হইতে সকৌতুকে ভঙ্গাস্বনের আচরণ দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে বিচিত্র বসনে—বেশভূষায় সজ্জিতা নবীনা নারী পুনঃ পুনঃ দেখিতেছেন সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে নিজ প্রতিবিম্ব। নিজের প্রতি

ভালবাসা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে—নারীত্বের উপরে মোহের আবেশ লাগিতেছে যেন। নিজ রূপে নিজেই মুগ্ধ—বিহ্বল হইলেন নবীনা।

রাজ-অশ্বকে নবীনা ছাড়িয়া দিলেন এবার। ফলমূল ভক্ষণ করায় দেহে শক্তির সঞ্চার হইল। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল বনভূমি। আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্রই এখন আর কাছে নাই। একবার বৃক্ষে আরোহণের চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। কোথায় তার সেই শক্তি। বিশাল পুরুষদেহের সমগ্র শক্তি অপহৃত। তিনি এখন কোমলা—অবলা।

রাজধানীর বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলেন তিনি।

ঐ যেন দেখা যায় বনাঞ্চল ভেদ করিয়া ক্ষীণ এক আলোকশিখা। হয়তো বা ঐখানে রহিয়াছে কোন বনবাসী অথবা মুনি ঋষির আশ্রম। ঐ আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন অতঃপর।

ক্রমশঃ এক ক্ষুদ্র কুটিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কুটিরের চতুর্দিকে কণ্টকগুল্ম দ্বারা সুরক্ষিত পুষ্পশোভা দেখিয়া চক্ষুদ্বয় আমোদিত হইল। মনোহরা ছায়াঘন তপোবন বলিয়া বোধ হইল।

অকুস্থলে কেহ নাই বুঝিয়া আকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—কেগো—কে আছ এখানে? আমি এক পথভ্রান্তা অসহায়া নারী—আশ্রয় চাই।

নিজ কণ্ঠস্বরের এমন সুললিত বীণানিন্দিত মধুর ধ্বনি যেন তাহার নিজ কর্ণেই মধুবর্ষণ করিল।

ক্ষণপরে কুটিরের নিগড় খুলিয়া প্রজ্বলিত দীপহস্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক তরুণ তাপস। নবীনাকে দেখিয়া তাঁহার চোখে বিপুল বিস্ময় ফুটিল!……কে এই মনোরমা অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী নারী! এই বিজন বনমাঝে এ কি মানবী—না দেবী—না অপ্সরী—না স্বপ্নমায়া!

অপরদিকে নারী দেহধারী ভঙ্গাস্বনের চোখে প্রতিভাত হইল এই প্রথম পুরুষ। আহা! এমন সুন্দর এত দ্যুতিমান মাধুর্যময় পুরুষ দেহ! আননে বিস্ময়ের অপরূপ বিভা বিকশিত হইয়াছে—একি মূর্তিমান কন্দর্পদেবতা!

বিস্মিত তাপস প্রশ্ন করেন—শুভে! কে তুমি? এই সন্ধ্যাকালে বিজন বনে পথভ্রান্তা কোন নারী—না দেবী—না অপ্সরী?

বিহ্বলা নারী উত্তর দেয়ঃ 'আমি কে জানিনা—আমার পরিচয় নাই! আমি চাই শুধু রাত্রির আশ্রয়।'

অস্ফুট স্বরে তাপস স্বগোতোক্তি করেন : 'আমি ক্লান্ত আমার একাকী নির্বাসিত জীবনে। ঈশ্বরপ্রাপ্তি বহুদূরে। যদি সঙ্গিনী হিসেবে একে পাই—যে আমার সম্মুখে, তবে গান্ধর্বমতে—

তাপসের অস্ফুট স্বরের অভীপ্সা শুনিয়া নবীনার হৃদয় বিপুল আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠে। আপন মনে ভাবিতে থাকেন—পুরুষ এত সুন্দর! তার কণ্ঠস্বর এত মধুর—এত আবেগময়! গভীর কণ্ঠে উত্তর দেন—ওগো অপরিচিত আমি তোমারই, প্রশ্ন কোরো না—কে আমি, জানতে চেও না আমার নিবাস, শুধু—

নিবিড় কণ্ঠে তাপস উত্তর দেন—অপরিচিতে, তুমি আমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী হবে। জানতে চাই না তোমার অতীত কাহিনী, লুকিয়ে রেখো তোমার আত্মপরিচয়। তবু, কি নামে তোমায় আহ্বান করবো ?

নাম আমার নেই। যে নামে ইচ্ছা ডেকো—হোক তা অর্থহীন !

নিজেই এসেছো তুমি স্বাগতা ; আমায় ডেকো তাপস বলে, আর তুমি হবে তাপসী।

ঋতুচক্র ঘুরিতেছে। বর্ষ যায়—নূতন বর্ষ আসে। কালপ্রবাহের অবাধ ধারায় নারীরূপী নৃপতি ভঙ্গাস্বন ভুলিয়া যান তাঁহার অতীত জীবনের কথা। সে জীবনের স্মৃতি তো স্বপ্নমাত্র। অথচ তার জন্য ক্ষোভ নাই—বেদনা নাই। এদিকে তাঁহার চলমান নারীজীবনে ইতিমধ্যে দশটি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছে। বিশাল সংসারে তিনি এখন নিমগ্ন--তাঁহার আত্মবিস্মৃতি এবং মায়াবদ্ধ যৌবন আজও অটুট। তাপস ধীরে ধীরে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হইয়াছেন।

আর স্বর্গাধিপতি বাসব ! তিনিও হয়তো ভুলিয়াছেন। ভঙ্গাস্বনকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার আক্রোশ হয়তো মিটিয়াছে। পর্জন্যদেবকে তিনি আদেশ দিয়াছেন বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে। সেই অবিশ্রান্ত ধারায় অগ্নিহোত্রী হোমানল নিভিয়া গিয়াছে—কেহ তাহাতে ইন্ধন যোগায় নাই।

বর্তমানের যুবতী তাপসী অনেকদিন পূর্বে দয়িত তাপসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে দেশের নৃপতি মৃগয়া করিতে গিয়া বনমধ্যে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। তাপসের মুখে শোনা এ কাহিনীর নায়িকা যে তিনি নিজেই তাহা কখনও প্রকাশ করেন নাই।

তাপসের মুখে আরও শুনিয়াছিলেন যে রাজগুরু গণনা করিয়া নাকি বলিয়াছেন—নৃপতি এখনও জীবিত, কোন স্থানে মায়াজালে

বন্দী হইয়া আছেন। অনেক সন্ধান করা হইয়াছে তাহার—তাহাকে উদ্ধারের অনেক চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু সবই বৃথা। তবুও এ পর্যন্ত শত রাজমহিষী বৈধব্য-বেশ পরেন নাই।

একদিন তাপসের মুখে সংবাদ পাইলেন—দ্বাদশ বর্ষকাল অতীত হইয়াছে। জনৈক ব্রাহ্মণের নির্দেশ অনুযায়ী নিরুদ্দিষ্ট পতির কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া এবারে নাকি বৈধব্য-বেশ ধারণ করিবেন মহিষীগণ। পুত্রগণ হইবে নিরুদ্দিষ্ট নৃপতির স্থলাভিষিক্ত।

এই সংবাদ শ্রবণে অধুনা তাপসী ভঙ্গাস্বনের হৃদয়ে জাগিল উদ্বেলতা। তিনি জীবিত—রাজ্যবাসীদের একথা জানাইবার প্রয়োজন আছে বৈকি। রাজগুরুর নির্দেশ অমান্য করা উচিত হয় নাই।

অথচ কোন এক জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণ আসিয়া ঐ নির্দেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বুঝাইয়াছেন নৃপতি দেহ পরিবর্তন করিয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন—সুতরাং শাস্ত্র অনুসারে তিনি মৃত। ব্রাহ্মণের যুক্তিজাল ও প্ররোচনায় রাজগুরুর বিচারশক্তি পরাজিত হইয়াছে। তাই—

তাপসীরূপী ভঙ্গাস্বন বুঝিয়াছেন কে ঐ ব্রাহ্মণ—নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী ক্রুর বাসব। এখনও সে বিদ্বেষবিদ্বিষ্ট।

এই মুহূর্তে একবার রাজপুরীতে যাওয়া উচিত মনে হইতেছে তাপসীর। সবাইকে জানানো প্রয়োজন যে বৃথা হইবে রাজ-মহিষীগণের বৈধব্য বেশ ধারণ। মহিষীদের মধ্যে কেহ কেহবা চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিতেও পারেন—ইহা রোধ করা তাঁহার আশু কর্তব্য।

পর দিবস প্রভাতে এক অপূর্ব সুন্দরী তাপসীকে রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া চারিদিকে জাগিল চঞ্চলতা। এমন সুন্দরী—মোহময়ী বিদ্যুৎমালাসদৃশ প্রভাযুক্ত লাবণ্যময়ী! কে ইনি?

রাজপুরীর বঙ্কিম পথগুলির সবই চেনা তাপসীর। রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই শত রাজমহিষী তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন।

প্রতি জনকে নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাকিলেন নব কলেবরা ভঙ্গাস্বন। পুত্রদের স্নেহচুম্বন দিলেন এবং মহিষীদের 'চিরায়ুষ্মতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজগুরু সাগ্রহে শুনিলেন সকল বিবরণ। অলৌকিক কাহিনীর অন্তরালে একদা নিরুদ্দিষ্ট নৃপতির স্ত্রীরূপে প্রত্যাগমনের বার্তাও শুনিলেন।

অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রাজান্তপুরের অতি গূঢ়

কথাগুলি বলিতে লাগিলেন তাপসীরূপী নৃপতি। নৃপতির এইরূপ প্রত্যাগমনে চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বহিল।

তবুও উভয়পক্ষের মনোভাবে কিছু বৈপরীত্য রহিয়া গেল।

মহিষীদের সংশয় ; ইনি কি তাঁদের স্বামী না ছদ্মবেশী অন্য কেউ ?

পুত্রদের জিজ্ঞাসা : ইনি কি তাদের পিতা না মাতা ?

প্রজাদের সন্দেহ : ইনি কি তাদের রাজা না রাণী ?

ইত্যাদি প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হইয়া ভঙ্গাস্বন অবশেষে কহিলেন—জানিনা আমি কি ? আমি তাপসী। ফিরিয়া যাই তবে আপন আশ্রমে। কিন্তু অনুরোধ তোমরা বৈধব্য পালন করিও না অথবা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিও না—শুধু এইটুকু জানাইতেই আমি আসিয়াছি। যদি কোনদিন ইন্দ্রমায়া লুপ্ত হয়—ফিরিয়া পাই পূর্বরূপ, তবেই পুনরাগমন করিব, নতুবা—

তাপসী চলিয়া গেলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিস্মিত—ক্ষুব্ধ। তাঁহার এত চেষ্টা এত মায়াজাল সকলি তবে কি বিফল হইল! কই, নৃপতির মনে তো রাজ্যলিপ্সা জাগিতেছে না। অতীতের অধিকার শূন্যতার জন্য বিষণ্ণ—বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন কিনা বোঝা যাইতেছে না। পরিবর্তে নবীন জীবনের জন্য তিনি যেন সদাতৃপ্ত—সদা হাস্যময়ী। তাঁহার নিকট পূর্বজীবন ভিক্ষা করিবার বাসনাই যেন নৃপতির আর নাই।

কৌতূহল বাধা মানিল না স্বর্গাধিপতির। একদিন দেবরাজ ব্রাহ্মণ বেশে তাপসীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নিজের অভিপ্রায় জানাইতে বলিলেন—ইন্দ্র মায়াজাল হইতে অচিরেই আপনাকে মুক্ত করিবেন বটে, পরিবর্তে অতীত কর্মের জন্য ইন্দ্রের প্রতি আপনার অনুতাপ জানাইতে হইবে।

অনুতাপ ? নতিস্বীকার !

এখন আর তাপসী ভঙ্গাস্বনের মনে কোনো বিদ্বেষ নাই। দ্বাদশ বৎসর নারীরূপে থাকিয়া তাঁহার পূর্বজীবনের সকল বিরাগ-বিদ্বেষ-নৃপতিসুলভ গর্ব ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কোথায় দেবরাজ। তাঁহাকে পূজা করিতে প্রণাম করিতে এখন তিনি সদা প্রস্তুত।

কৌশলে নৃপতির মনের কথা জানিয়া ব্রাহ্মণ মুহূর্তে মিলাইয়া গেলেন। সেখানে সহসা আবির্ভূত হইলেন দ্যুতিমান স্বর্গাধিপতি।

বাসবকে দেখিবামাত্র বিস্ময়বিহ্বল নৃপতি ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন।

প্রসন্ন তুষ্ট দেবরাজ কহিলেন—স্বস্তি! রাজা ভঙ্গাস্বন, তোমার শাস্তিকাল পূর্ণ হইয়াছে, তুমি এই নন্দনকাননজাত মন্ত্রপূত ফল ভক্ষণ কর, এখনই পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইবে।

অভিভূত নৃপতি কম্পিত হস্তে অঞ্জলি পাতিয়া দেবফল গ্রহণ করিলেন। সানন্দে ফলটি ভক্ষণ করিতে উদ্যোগী হইতেই সহসা শুনিলেন ক্রন্দনধ্বনি। চকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন প্রৌঢ় তাপস কখন পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে উদ্বেগমিশ্রিত বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। চক্ষে বহিতেছে বারিধারা। তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে পুত্রকন্যাগণ। আসন্ন মাতৃহারা হইবার পরিণাম বুঝিবার বয়স হইয়াছে তাহাদেরও।

পশ্চাতে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের কাতর আর্তনাদ ধ্বনিত হইল : মা—মা!

তাপসের কণ্ঠে আসন্ন বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী ধ্বনি বাজিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—প্রিয়ে, আমায় ফেলে যেও না—আমি একান্ত অসহায়।

মুহূর্তে নারীরূপী—পত্নীরূপী—মাতৃরূপী ভঙ্গাস্বনের দেহের রক্তধারা উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। মধুর স্বাদময় কি এক আবেগের শিহরণ সিঞ্চিত হইল সর্ব্বদেহে।……কই, বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলনের সময়ে মহিষীদের নয়নে দেখিয়াছেন শুধু বিস্ময়ের ছায়া—আনন্দদীপ্তি সেখানে ছিল অনুপস্থিত। মনে পড়িতেছে পূর্বের অবস্থায় শুধু দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা—রাজার প্রসন্ন অনুগ্রহ লাভের জন্য কত না ছলাকলা। সেখানে ছিল না প্রেম ভালবাসা—মমতা—আবেগ—অনুরাগ—মান-অভিমান। আর, সেদিনও শত রাজপুত্রের চক্ষুতে দেখিয়াছেন আনন্দের পরিবর্তে আতঙ্কের ছায়া! আসন্ন নৃপতি পদে বৃত হইতে বাদ সাধিবার জন্যই নারীরূপী রাজার প্রত্যাগমন হইয়াছে বলিয়া তাহারা ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছিল। এখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন রাজ-সিংহাসনে আছে ক্ষমতার লড়াই, নাই সেখানে হৃদয়ের সংযোগ।

আর এই রাজ্যে! হ্যাঁ—এই রাজ্য ক্ষুদ্র নয়, বিশাল এ হৃদয়—সাম্রাজ্য। প্রেম—ভালবাসা—মায়া—মমতা—স্নেহ-প্রীতি সবই এখানে নিখাদ। জননীরূপে নিজ দেহজাত পুত্রকন্যাগণের ভালবাসা জনকরূপী শত পুত্রের ভালবাসার চাইতে অনেক গভীর—অনেক সত্য!

আর তাঁহার স্বামী! একনিষ্ঠ প্রেমময় বক্ষে তাপসী ছাড়া আর

কাহারও স্থান নাই। সে প্রেম অসীম—অব্যয়—অনন্তব্যাপী…সেখানে শুধু দেওয়া, চাহিবার কিছু নাই!

বিহ্বল আবিষ্ট রাজা ভঙ্গাস্বন যেন তাঁহার প্রকৃত সত্তা ফিরিয়া পাইলেন। চাহিলেন স্বামীর আসন্ন বিরহার্ত নয়নের সজল বারিবিন্দুর দিকে! চাহিলেন পুত্রকন্যাগণের উদ্বেগ ব্যাকুল অশ্রুসিক্ত আননের দিকে…

কম্পিতকণ্ঠে ভঙ্গাস্বন বলিলেন—"দেবরাজ—আমায় ক্ষমা করুন—আপনার অভিশাপই আমার আশীর্বাদ! আপনার অমৃতফল ফিরাইয়া লউন।"

বিস্মিত বাসব প্রশ্ন করিলেন—"পুরুষত্ব, সাম্রাজ্য, রাজ-সিংহাসন—এসব কি কাম্য নয়?"

গভীর কণ্ঠে রাজা ভঙ্গাস্বন উত্তর দিলেন—না!!

নারদ ও সুকুমারী

তপোবনের নির্জন কুটিরে বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া আছেন ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ। একাকীত্ব অসহ্য···ত্রিভুবনে বন্ধুহীন সঙ্গীহীন জীবন আর কাটিতেছে না। ইচ্ছা করিলেই তিনি বিষ্ণুলোক—দেবলোক—শিবলোক পরিভ্রমণ করিতে পারেন। সম্মান সমাদার সবই তাহার করায়ত্ত, তবুও তিনি নিরানন্দ—কারণ এই নিঃসঙ্গ অলস জীবন···।

কিন্তু কেন?···কারণ, কলহপ্রিয় বলিয়া তাঁহার দুর্নাম সর্বজনবিদিত। নিজে কোন কলহ করেন না—কিন্তু সামান্য কারণে পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিয়া তিনি অব্যক্ত আনন্দলাভ করেন। তাই সকলে তাঁহাকে ভয় করে। বীণা যন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া তাঁহার নিজস্ব ধারণা। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীকে বেসুরো বেতালে গাহিয়া বিকলাঙ্গ করিয়াছিলেন—সে কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। রাগেশ্বর দেবাদিদেব মহেশ্বর তাঁহাকে রাগাশ্রয়ী সঙ্গীত গাহিতে নিষেধ করিয়াছেন···কিন্তু তিনি থামেন নাই। সঙ্গীতে তিনি আত্মসমাহিত থাকেন, কিন্তু···

কিন্তু আজ সেই সুর তাঁহার বীণা যন্ত্রে বাজিতেছে না। আজ যেন সবই বেসুরো ছন্দহীন, কারণ সঙ্গীনী জুটিতেছে না তাঁহার। বিবাহ করিবার এবং সংসার করিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল···কিন্তু তাঁহাকে কন্যাদান করিতে কেহ চাহেন না। কারণ তিনি বেসুরো-সঙ্গীত বিশারদ, কলহপ্রিয়—সর্বোপরি অভিশপ্ত!

আপন ভাগিনেয় মহর্ষি পর্বত তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছেন—'তিনি বিবাহ করিবামাত্র পত্নী তাহার মুখদর্শন করিলেই দেখিবেন—বানরাকৃতি, বিকট ও বিকৃত! বাধ্য হইয়া তিনি অবিবাহিত। তাঁহাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করাইবার ইহা এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। দেবীরা দূরে পলাইয়াছে! চন্দ্রদেবতা তাঁহার এক দুহিতাকে মহর্ষির হস্তে সম্প্রদান করিবেন শুনিয়া প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু—

সোমদেব অভিশাপগ্রস্থ নারদকে বলিয়াছেন—বানরাকৃতি স্বামী হইবে ইহা জানিয়া তিনি তাঁহাকে কন্যাদান করিতে অসমর্থ—হোউন না তিনি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি বা আর কিছু···

সেই সঙ্গে উপদেশ দিয়াছেন—পিতা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে আবেদন করিয়া একটি বানরাকৃতি দেবী বা মানবী সৃষ্টি করিবার জন্য···সেক্ষেত্রে রাজযোটক হইবে বটে !

সুতরাং তাহার অবিবাহিত সঙ্গীহীন জীবন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেন নিজ ভাগিনেয় পর্বতের এই মর্ম্মচ্ছেদী অভিশাপ ?···

দুইজনে একত্রে পর্যটন করিতে করিতে একদা অতিথি হইয়াছিলেন মহারাজ সৃঞ্জয়ের প্রাসাদে। মহারাজ পরম সমাদরে দুইজনকে রাজপ্রাসাদে মাননীয় অতিথি হিসাবে আশ্রয় দেন এবং কুমারী রাজকন্যা সুকুমারীর উপরে অতিথি পরিচর্যার ভার অর্পণ করেন।

পর্যটনকালে উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন···পরস্পরের কোন মনোভাবই তাঁহারা গোপন রাখিবেন না···মুক্তচিত্তে তীর্থ পর্যটন করিয়া আবার নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিবেন !

কিন্তু মৃগনয়না ললিতলবঙ্গলতা মনমোহিনীকে দেখিয়া দেবর্ষির চিত্ত চঞ্চল হইল। যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও হৃদয়কে সংযত রাখিতে পারিলেন না ! রাজকুমারীর মধুর আলাপ, পদসঞ্চারের অস্ফুট শব্দেও তাঁহার রক্ত উচ্ছ্বলিত হইল ! নয়নে ফুটিয়া উঠিল নীরব অর্থপূর্ণ ভাষা !

দেবর্ষি পর্বতের কাছে একথা গোপন করিলেও মহর্ষি পর্বত জানিলেন—অতিথিসেবারতা কুমারীর প্রতি সেই চিত্তবৈকল্য। ইহা কৃতঘ্নতা ! তাই মহর্ষি দেবর্ষিকে দিলেন এই দারুণ অভিশাপ !

দিন চলিতেছে—ঘুরিতেছে বর্ষচক্র ! দেবর্ষি অশান্ত চিত্তে বিশ্ব-ভ্রমণে বাহির হইলেন ! মদন শরাঘাতে তাঁহার বিদগ্ধ হৃদয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৃঞ্জয়কন্যা রাজকুমারীর চারিপার্শ্বে ফিরিতেছে।

শেষে একদিন পুনরায় বিভ্রান্ত নারদ উপস্থিত হইলেন মহারাজ সৃঞ্জয়ের গৃহে অতিথিরূপে !

দেবর্ষিকে দেখিলেই সর্বত্র চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে ! এই বুঝি কোথা হইতে কোন্ কলহ সৃষ্টি হয় !···আসে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ! আর অভিশাপ !

পূর্বেও মহারাজ সৃঞ্জয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—দেবর্ষি যেন চিন্তিত বিষণ্ন ! মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রতিফলিত ! এবার দেখিলেন—বীণাহীন দেবর্ষি নারদ ! মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া···কৃশ ও মলিন !

বিস্মিত হইলেও নৃপতি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অতিথি নারায়ণ! তিনি সাদরে নারদকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন…! রাজকুমারী সুকুমারীকে আদেশ দিলেন যথারীতি অতিথির পরিচর্যা করিতে।

রাজকন্যা প্রত্যহ আসেন সখিদের সঙ্গে। পূজা এবং দেবার্চ্চনার সকল আয়োজন নিজ হস্তে করেন! পুষ্পদল চয়ন করিয়া মালা গাঁথেন…! পূজার নানা উপাচার সাজাইয়া দেন! দেবর্ষি নারদ মুগ্ধ চিত্তে তখন রাজকুমারীর দিকে চাহিয়া থাকেন। সে চোখের ভাষা রাজকন্যার অজানা থাকে না।

পিতার আদেশই সমাজবিধি। উচ্চবর্ণ কোন বিশিষ্ট অতিথি সমাগমে রাজরাণী বা রাজকুমারী অতিথি সেবার ভার লইবেন! ইহাই দেশাচার…ইহাতেই পুণ্য লাভ।

একদিন একাকী পাইয়া নারদ গাঢ়স্বরে ডাকিলেন—রাজকুমারী।

সুকুমারী সেই স্বরে অভিভূত হইলেন। বলিলেন—আদেশ করুন প্রভু।

তুমি কেমন স্বামী কামনা কর?

আমি কুমারী…পিতার অধীন! একথা আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কেন প্রভু?

"পিতার অধীন"—কথাটি যেন দেবর্ষি তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া ল'ন। বলেন—বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারীদের স্বামী নির্বাচনের অবাধ অধিকার… এ মনুর বিধান, এ তোমার অজানা নয়।

মৃদু হাসিয়া সুকুমারী উত্তর দেন—সে অপারগ অসমর্থ অশক্ত পিতার ক্ষেত্রে! আমার পিতা স্নেহশীলা মহান…এ ভার তাঁরই!

কিন্তু—দেবর্ষি একটু থামিয়া বলিলেন—যদি সেই নির্বাচিত স্বামী বানরাকৃতি বা বিকৃত হন, তবে?

বিস্মিত সুকুমারী কোন উত্তর দিলেন না।

অধীর স্বরে দেবর্ষি কহিলেন—বল রাজকুমারী, স্বামী যদি বানরাকৃতি বা বিকট ও বিকৃত হয় তবু, তবুও কি…?

বুঝিব আমি ভাগ্যহীনা অভিশপ্তা।

উত্তর শুনিয়া অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠেন দেবর্ষি নারদ!

সেই শব্দে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকেন রাজবালা সুকুমারী!

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল নারদের কক্ষ শূন্য। দেবর্ষি কখন গৃহত্যাগ করিয়াছেন কেহ জানে না। এক নিষ্কলঙ্কা কুমারীকে

ভাগ্যহীনা—অভিশপ্তা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। প্রার্থনা করিলে অবশ্য নৃপতি সৃঞ্জয় প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হইবেন এ বিশ্বাস তাঁহার আছে, কিন্তু—

কোন নারীকে ভাগ্যহীনা অভিশপ্ত জীবনযাপন করিবার জন্য বাধ্য করিতে বিবেক সমর্থন করে না। মহর্ষি পর্বতের অভিশাপ—পর্বতেরই মত তাঁর সংসারাশ্রমের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।

গৃহত্যাগ করিয়া উদভ্রান্তের মত দেবর্ষি নারদ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পুষ্পশর-বিদ্ধ হৃদয় মানিল না—শ্রান্ত অলস দেহমন লইয়া আবার ফিরিলেন। ইতিমধ্যে মাত্র দুই দণ্ড কাল অতীত হইয়াছে, অথচ মনে হইতেছে যেন কতযুগ !

ফিরিয়া সঙ্কোচে প্রাসাদ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন তিনি। জানেন··· নিশ্চয় তাঁহার খোঁজ পড়িয়াছে। সবাই চিন্তিত—বিচলিত ! তিনি ধীরে ধীরে রাজোদ্যানের পুষ্পকুঞ্জের পার্শ্বে আসিলেন—

বৃক্ষশাখায় কপোতকপোতীর প্রিয়-সম্ভাষণ, পাপিয়ার পিউ পিউ কল-কাকলি—অদূরে ময়ূরময়ূরীর ছন্দময় নৃত্য—

সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল পুষ্পকাননের নিভৃত কুঞ্জে ! রাজকুমারী একাকিনী একটি পুষ্পমালিকা নিজ বক্ষে চাপিয়া বসিয়া আছেন—কি যেন চিন্তায় নিমগ্ন। এ মাল্য দেবর্ষির চেনা। প্রতিদিন প্রভাতে রাজবালা নিজ হস্তে গাঁথিয়া তাঁহাকে উপহার দেন···সঙ্গে নানা পুষ্পসম্ভার—পূজার নানা উপকরণ !

ধীরে ধীরে পা টিপিয়া নিঃশব্দে পুষ্পকুঞ্জের পশ্চাৎদিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন দেবর্ষি নারদ। লতাকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে রাজকন্যার আচরণ স্পষ্ট প্রতিভাত। তিনি বিস্মিত হন···

রাজকন্যার অস্ফুট স্বর প্রবেশ করে তাঁহার শ্রবণে : দেবর্ষি—আপনি বিরাট, আপনি মহান। ক্ষুদ্র মানবকন্যার প্রেম আপনার কাছে তুচ্ছ ! আপনাকে নিবেদিত অবহেলিত নির্মাল্যকে আমি আজ নিজের বক্ষে স্থান দিয়েছি···

সন্তর্পণে নিঃশব্দে পিছাইয়া আসেন দেবর্ষি !···বক্ষে তাঁহার অব্যক্ত জ্বালা—বিবাহ সমাপ্তমাত্রই স্ত্রী তাঁহার স্বামী-মুখ দেখিবে—বানরাকৃতি-বিকট-বিকৃত, ফলে স্ত্রী হইবে ভাগ্যহীনা অভিশপ্তা··· ।

মহারাজ সৃঞ্জয় কিন্তু আনন্দিত। প্রভাত হইতে দেবর্ষিকে পাওয়া যাইতেছিল না। মহারাজের আশঙ্কা হইয়াছিল বুঝিবা কোন ত্রুটির জন্য দেবর্ষি গৃহত্যাগ করিয়াছেন সকলের অলক্ষ্যে !

না—এ ধারণা ভুল। হয়তো প্রাক্ উষাকালে প্রাতঃভ্রমণের জন্য নারদ বাহিরে গিয়াছিলেন—এখন ফিরিয়াছেন! নূতন করিয়া পূজা-উপাচার সাজান হইল। মহারাজ নিশ্চিন্ত হইলেন!

সূর্যদেব অস্তাচলগামী। দেবর্ষি নারদ অস্থির চরণে রাজোদ্যানে বেড়াইতেছেন…ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। রাজা সৃঞ্জয়সহ অনেকেই দেবর্ষির এই চিত্তবৈকল্যজনিত অস্থিরতা লক্ষ্য করিতেছেন!

নৃপতি আসিয়া দেবর্ষিকে আপ্যায়ন করিলেন।

আশীর্বাদ করিয়া অস্থির কণ্ঠে দেবর্ষি বলিলেন—দীর্ঘায়ু হইয়া শান্তিতে প্রজাপালন কর; মহারাজ সৃঞ্জয়…তোমার নিকটে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

প্রার্থনা! মহারাজা বিস্মিত হন। বলেন—দেবর্ষি, সম্ভব অসম্ভব যাহা কিছু সবই আপনাকে প্রদান করিতে আমি প্রস্তুত! বলুন কি আপনার অভিরুচি?

একটু থামিয়া কম্পিত কণ্ঠে দেবর্ষি বলিলেন—তোমার কন্যা সুকুমারী…তাকে আমার সহধর্মিনী করে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে চাই।

মহারাজ সৃঞ্জয় ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইলেন। তারপর বলিলেন—ব্রহ্মার মানস সন্তান দেবর্ষি নারদকে জামাতা রূপে পাওয়া আমার পরম সৌভাগ্য। আমার কন্যা পরম সৌভাগ্যবতী!

সৌভাগ্যবতী! নারদের কণ্ঠ চিরিয়া এক অস্ফুট আর্তনাদ বাহির হইল। অধীর কণ্ঠে কহিলেন—আমার একটি সর্ত আছে মহারাজ সৃঞ্জয়।

সর্ত! বিস্মিত হন নরপতি।

নারদ বলিয়া চলেন: আমার সর্ত—আপনার কন্যার স্বামীমুখ দর্শন নিষিদ্ধ! সম্প্রদান কাল হইতে তাহার চক্ষু দুইটি সপ্তপ্রস্থ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। কার্যতঃ তাহাকে যাপন করিতে হইবে অন্ধজীবন। এই কঠোর সর্তে যদি আপনার কন্যার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকে তবে এ বিবাহ সম্ভব হইবে না। আমি হাসিমুখে গ্লানিহীন চিত্তে বিদায় লইব!

দেবর্ষি স্তব্ধ হইলেন!

উৎসব মুখরিত বিবাহ-আসরে সকলে বিস্মিত! রাজকুমারী স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব! সপ্তধা চীরখণ্ড দিয়া

চিরকাল চক্ষু আবৃত রাখিবেন···পৃথিবী তাঁহার কাছে চির অন্ধকার! কিন্তু কেন?

ভাবী স্বামীর ইহাই বাসনা!

রাজকন্যা সুকুমারী জানাইয়াছেন—স্বামী তাঁহার ত্রিভুবনখ্যাত ব্রহ্মার মানসসন্তান। নিশ্চয় এই সর্তের পশ্চাতে আছে কোন গূঢ় রহস্য। পূর্বে যেন এই ধরনের কিছু ইঙ্গিত করিয়াছিলেন! আর স্বেচ্ছা-অন্ধতা?···পৃথিবীতে দৃষ্টিহীনের অভাব নাই। না হয় স্বামীর ইচ্ছায়—।

কোন ক্ষোভ বা বিকৃতি রাজকন্যার হৃদয়ে নাই। তিনি সানন্দে বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন।

হিমালয়ের নিভৃত কাননে উদ্যানশোভিত মনোহর তপোবন! পুষ্প-কুঞ্জে নানারূপ স্বর্গীয় ফুলদল। ফলবান বৃক্ষশোভিত উদ্যান নানারূপ বিহঙ্গের কলকাকলীতে মুখরিত।

দেবর্ষি বৃক্ষতলে পক্ষীকুঞ্জ নির্মাণ করিয়াছেন। প্রভাতে তাহাদের কলকাকলী লক্ষ্য করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে যান নারদপ্রিয়া সুকুমারী। দৃষ্টিহীন অবস্থার অসহায়তা ধীরে ধীরে কমিতেছে। দেবর্ষি বারবার অনুরোধ করিয়াছেন তিনি যখন অন্যত্র গমন করিবেন তখন দণ্ডক্ষণ নির্দেশ করিয়া ফিরিবেন! ঐ অবসর সময়ে সুকুমারী যেন চক্ষুবন্ধনী খুলিয়া রাখেন।

না···যদি অকল্যাণ হয়? সুকুমারী স্বামীর উপরোধ রাখেন নাই। স্বামীর আবেগমধুর প্রেমময় স্বরমাধুরী তাঁহার প্রাণ মন ভরাইয়া দেয়! নাই বা দেখিলেন স্বামীর মুখমণ্ডল, মাটীর দৃশ্য—আকাশের মেঘমালা—তুষারমৌলি হিমালয়ের অপূর্ব শোভা।

কিন্তু স্বামীর প্রেম অনন্ত অব্যক্ত, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাতেই তিনি পরিপূর্ণা··· !

সেদিন প্রভাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন···সহসা তীক্ষ্ণধার কণ্টক পদতলে গভীরভাবে বিদ্ধ হইল। আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িলেন পুষ্পচয়নরতা রাজকুমারী। মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতা চক্ষুর আবরণ খুলিয়া কণ্টক তুলিতে গেলেন।

সেই আর্তনাদ প্রবেশ করিল দেবর্ষি নারদের কর্ণে। তিনি জ্ঞান-শূন্য হইয়া পুষ্পকাননের দিকে ধাবিত হইলেন।

স্ত্রী দেখিলেন—একটি বানরাকৃতি বিকৃত বিকটদর্শন অর্দ্ধমানব

তাহার দিকে ধাবমান। অর্ধমানবের ঊর্দ্ধাংশ রোমশাবৃত এবং নিম্নাঙ্গ বানরাকৃতি।

আর স্বামী দেখিলেন—তীক্ষ্ণধার কণ্টকবিদ্ধ হইয়া সুকুমারীর মুখমণ্ডল বেদনার্ত…তাঁহার সর্বাঙ্গে ভয়ার্তের বিমূঢ়তা…

সকল কিছু ভুলিয়া রমণীর কণ্টকবিদ্ধ পদ নিজ অঙ্কে তুলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন দেবর্ষি নারদ… ।

সহসা দেখিলেন—সুকুমারী সংজ্ঞাহীনা!

পরম স্নেহে ক্রোড়ে করিয়া তাহার সংজ্ঞাহীন দেহভার বহন করিয়া শয্যায় শায়িত করিলেন দেবর্ষি…ভুলিলেন—সুকুমারীর নয়নাবরণ সরিয়া গিয়াছে—

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিকটাকৃতি বানররূপ দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া সুকুমারী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন—

এতক্ষণে নারদ সব বুঝিলেন! নিয়তি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মিথ্যা বস্ত্রাবরণ সরাইয়া নিয়তি কঠোর সত্যকে সম্মুখে আনিয়াছে। এখন শুধু বাস্তব…করুণ…নিদারুণ…তবু বাস্তব!

ধীরে ধীরে রাজকুমারীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে। দেবর্ষি নারদ সযত্নে তাঁহার নয়ন চীরখণ্ড দিয়া আবৃত করিয়া দিলেন।

ভয়ার্ত বিহ্বল কণ্ঠে সুকুমারী ডাকিল—প্রভু, কোথায় তুমি?

আমি তোমার পাশেই প্রিয়া। কণ্টক বাহির হইয়াছে, ভীত হইও না।

কোথায়—কোথায় সেই বানরাকৃতি নরদানব?

নরদানব! না—না সুকুমারী, আমিই তোমার দেখা সেই বানরাকৃতি হতভাগ্য। আমি যে অভিশপ্ত!

সুকুমারী উঠিয়া বসেন! অস্ফুটকণ্ঠে বলেন, কিন্তু—

হ্যাঁ প্রিয়া—যা'কে দেখেছো সেই মর্কটরূপী অর্দ্ধমানব আমিই। আমি মহর্ষি পর্বতের নিকটে অভিশপ্ত…বিবাহমাত্রেই স্ত্রী স্বামীর মুখ দর্শন করিবে বানরাকৃতি বিকৃত বিকট! তাই সেই সর্ত…তোমার চক্ষে… আমায় ক্ষমা কর রাজকুমারী…অভিশপ্ত হতভাগ্যকে ক্ষমা কর!

অস্ফুটস্বরে সুকুমারী বলেন—তাই আমার চক্ষে এই সপ্তধা চীরখণ্ড দিয়া নয়নাবরণ! একথা এতদিন বলেন নাই কেন প্রভু! আমি কি এতই হৃদয়হীনা বিলাসিনী যে রূপসর্বস্ব স্বামীর প্রতিই হ'বে আমার অনুরাগ। প্রেম-ভালবাসা অব্যয়-নিখাদ, তা'র কি কোন মূল্যই নাই?

দুই হস্তে চক্ষের বস্ত্রাবরণ সরাইতে থাকেন রাজবালা সুকুমারী। তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল দেবর্ষির কণ্ঠস্বর…যদি তোমার প্রেম হয়

নিখাদ—যদি তোমার অভিশপ্ত স্বামীর প্রতি ঘৃণার উদয় না হয় তবে তোমার চোখের আবরণ—

অনুরাগের দীপ্তিতে ধীরে ধীরে সুকুমারীর চক্ষে দেবর্ষির বানরাকৃতি মুখমণ্ডলের দ্রুত পরিবর্তন হইতে লাগিল। রূপহীন রূপ প্রেমের কজ্জ্বলে সমুজ্জ্বল হইয়া নয়নমনোহর রূপে পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

আবেগরুদ্ধ গাঢ়স্বরে সুকুমারী বলিলেন—প্রভু তুমি এত সুন্দর!



সোমকন্যা ও উতথ্য

সোমকন্যা জ্যোৎস্নাকালী চন্দ্রলোকের মুক্ত গবাক্ষে বসিয়া নিম্নে পৃথিবীর অপরূপ শোভা দেখিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্ছুরিত রজতরশ্মি ধরাতলে সাগর ঊর্মিমালার সহিত যেন মিতালি পাতাইয়াছে। তরঙ্গের নৃত্যরঙ্গে চন্দ্রলোক হইতে দৃশ্যমান হইতেছে লক্ষ রূপালী আলোকের ঝিলিমিলি। আকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষা করিতেছে সোমকন্যা।

তাহার পিতা চন্দ্রদেবতা সোম এবং সাগরদেবতা বরুণ একই লগ্নে সমুদ্রমন্থন কালে সাগরতল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। সোমদেবের অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া ঈর্ষান্বিত দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অমরাবতীতে দেবত্বদানে অস্বীকার করেন—তিনি অদিতি তনয়, দেববংশ নন এই যুক্তিতে। তাঁহার রূপ দেখিয়া অপ্সরীকুলসম্ভবা উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকাদি বিহ্বল হন। প্রকৃতপক্ষে উহাই আশংকা ছিল তাহার।

শেষে ব্রহ্মার নির্দ্দেশে দেবত্ব লাভ করিয়া চন্দ্রলোকের অধিপতি হন সোমদেব। প্রজাপতি দক্ষের সপ্তবিংশ নন্দিনী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া একযোগে তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

জ্যোৎস্নাকালী তাহাদের প্রথম সন্তান—সপ্তবিংশতি মাতার নয়নমণি, পিতার হৃদয়রঞ্জনী। পরম আদরে সে পালিত হইয়াছে—এখন বিবাহের বয়স হইয়াছে; সুতরাং…।

কন্যার জন্মলগ্ন হইতেই সোমদেব তাহার ভাবী জামাতা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—তাহার সহিত একই দিনে সাগর-গর্ভ হইতে উত্থিত জলদেবতা বরুণদেবের সহিত। তিনিও দেবসমাজে অপাংক্তেয়। তাই তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে রসাতলে—অতল সাগরের বরুণালয়ে। সেখানে তিনি অধীশ্বর। তিনিও প্রিয়বন্ধু চন্দ্রদেবের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিয়াছেন জ্যোৎস্নাকালীর জন্মলগ্নেই।

অনন্ত যৌবন বরুণদেবকে কন্যাদান করিয়া জামাতারূপে গ্রহণ করিতে চন্দ্রদেব আগ্রহী—পরম আকাঙ্ক্ষিত সপ্তবিংশতি মাতৃগণের নিকটেও। আজ সন্ধ্যালগ্নে চন্দ্রদেব পূর্ণিমার রজতালোকে সাগরের বক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া রজতগর্ভ রথে বরুণালয়ে যাত্রা করিয়াছেন বিবাহের দিন স্থির

করিতে। পূর্বেই কন্যার বাগদানপর্ব সমাপ্ত—এখন শুধু শুভলগ্ন দিনক্ষণ দেখিয়া সমগ্র দেবসমাজকে আমন্ত্রণের অপেক্ষা।

পিতা সুসংবাদ বহন করিয়া ফিরিবেন—অধীর প্রতীক্ষায় রহিয়াছে জ্যোৎস্নাকালী। ঊষালগ্নের পূর্বেই পিতার ফিরিবার কথা। অথচ ফেরেন নাই। কেন—কেন—এই বিলম্ব! তাই জ্যোৎস্নাকালী চিন্তিত, বিচলিত।

সহসা তাহার দক্ষিণ নেত্র কম্পিত হইল। কোমল করপুট হইতে শুভ্র কুবলয় পুষ্পদল খসিয়া পড়িল। না না, অশুভ লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে! সোমকন্যা শিহরিত হইল!

ঊষাদেবী অপসৃয়মান জ্যোৎস্নালোককে মুছিয়া আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠারতা। এমন সময় দূরে সোমদেবের রজতগর্ভ রথ দেখা গেল—উৎফুল্ল হইল জ্যোৎস্নাকালী। ঐ দেখা যায় রথোপবিষ্ট তাঁহার অবয়ব—একটু পরে আরও নিকটে প্রাসাদ দ্বারে পিতার মুখমণ্ডল দেখা গেল। একি! সদা হাস্যময় তাহার মুখমণ্ডল ঘনকৃষ্ণছায়াচ্ছন্ন কেন? দূর হইতে কন্যাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন কেন পিতা? উদ্বেগে হৃদয় কাঁপিল—অস্থির হইল সে। ছুটিয়া পিতার নিকটে যাইতে চাহিল—কিন্তু পদদ্বয় যেন আড়ষ্ট।

চন্দ্রদেব পুরীতে প্রবেশ করিলেন। জ্যোৎস্নাকালীর সপ্তবিংশ মাতাগণ, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিলেন। তারপর! সোমকন্যার কর্ণকুহরে ভাসিয়া আসিল মাতৃগণের আকুল ক্রন্দনরোল। তবে কি বরুণদেবতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! বাগ্‌দত্তা বধূকে গ্রহণ না করা দেবধর্ম নয়—তবে!

প্রকৃতই দুঃসংবাদ! সোমদেব বরুণালোকে যাইবার পথে সমুদ্রতীরে রথ স্থাপন করেন—উহার নিকটে তখন ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গীরাতনয় মহর্ষি উতথ্য ধ্যানস্থ ছিলেন। রথের শব্দে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় এবং ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হন। শেষে সোমদেব অনেক মিনতি করিয়া মার্জনা ভিক্ষা চাহিয়া ঐ স্থানে রথ স্থাপনের কারণ বিবৃত করিলে মহর্ষি এক হৃদয়বিদারক প্রস্তাব দেন সোমদেবকে। মহর্ষি উতথ্যের স্ত্রী মমতা অত্যন্ত মুখরা ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। একদিকে তিনি যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছেন অন্যদিকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার আশ্রমে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী রহিয়াছে। তাহাদের পরিচর্য্যা করিবার কেহ নাই। রন্ধনকার্য্যে তিনি নিতান্ত অপটু। তাই অবিলম্বে শান্তস্বভাবা ভার্য্যা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সুতরাং সোমদেব যদি

তাঁহাকে কন্যাদান করেন তবেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। সোমদেব এই হৃদয়বিদারক প্রস্তাব শুনিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলে ক্রুদ্ধ মহর্ষি তাঁহাকে দারুণ অভিশাপ দিবেন বলিয়া সতর্ক করেন—সেই অভিশম্পাতের অর্থ চন্দ্রপুরের প্রতিটি অধিবাসী কুৎসিত বিকলাঙ্গ হইবে— নিজে, কন্যা এবং তাহার স্ত্রীগণ কেহই মুক্তি পাইবে না—তাই সকলের মঙ্গলচিন্তায় তিনি কন্যাকে—

ক্রন্দনরোলের মধ্যে বিবাহ হইল। নতমস্তকে অশ্রুসজল চক্ষে বৃদ্ধ মহর্ষিকে সোমকন্যা স্বামীত্বে বরণ করিল কিন্তু তাহার অন্তর কিছুতেই ইহাতে সম্মতি দিল না। মাতৃগণ যখন বিদায় দিলেন—তখন তাঁহাদের সুগৌর মুখমণ্ডল কৃষ্ণভাব ধারণ করিয়াছে—অবিরাম ক্রন্দনে চক্ষুদল রক্তবর্ণ। পাংশুবর্ণ সোমদেবও। কিন্তু ভবিতব্য অনিবার্য।

পতিগৃহে আসিয়া মহর্ষির আশ্রমে গৃহকর্মে নিযুক্তা হইল চন্দ্রলোকের পরম আদরিণী সোমকন্যা—জ্যোৎস্নাকালী। অপটু হস্ত তাহার—কোনদিন দুগ্ধ দোহন করে নাই। রন্ধনকার্য্য কাষ্ঠচয়ণ সবই তাহার পক্ষে নূতন ও পরম কষ্টসাধ্য। ভাগ্যের পরিহাসে সবই করিতে হইতেছে। আশ্রম-বালাগণ তাহার সহিত সখিত্ব পাতাইতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহার অপ্রসন্ন মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আর আসে নাই। বুঝিয়াছিল নূতন মহর্ষি-ভার্য্যা এই অসম বিবাহে একান্ত অসুখী। মহর্ষি সবই বুঝিতেন কিন্তু তাহার জন্য কোন সমবেদনা বা অনুশোচনা ছিল না, বরং তিনি গর্বিত।

একদিন সোমকন্যা সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মনে নিজের ভাগ্যলিপি চিন্তা করিয়া অশ্রুধারায় কপোল সিক্ত করিতেছিল। এমন সময় মহর্ষি কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—তুমি বরুণদেবের প্রতি অনুরাগিণী, কিন্তু এখন শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইয়াছে, এখন তোমার এই চিন্তা অসতীর লক্ষণ।

এই নিষ্ঠুর বাক্যে জ্যোৎস্নাকালীর ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধস্বরে বলিল সোমকন্যা—'অসতী? এই বিবাহ আমি অস্বীকার করি। ব্রাহ্ম, আর্য্য, প্রাজপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, দৈব, অসুর—এই অষ্ট বিবাহের কোনটাই এই বিবাহের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। পিতাকে অভি-সম্পাতের ভয় দেখাইয়া কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। পিতা বিবাহে প্রকৃষ্টমত মন্ত্র উচ্চারণ করেন নাই। আমিও কর্ণকুহরে কন্দর্মপিণ্ড লিপ্ত করিয়া নিজেকে বধির করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাল্যদানকালে নিজ চক্ষু নত রাখিয়াছিলাম। আমি পূর্বেই বরুণদেবতাকে কায়মনোবাক্যে পতিরূপে

বরণ করিয়াছিলাম। আপনি তাহার বাগ্‌দত্তা বধূকে অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন—আপনার এই কার্য্য পরস্ত্রী অপহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়—আপনি মহাপাপের কার্য্য করিয়াছেন।'

পত্নীর তীক্ষ্ন তিরস্কারে মহর্ষি স্তম্ভিত হইলেন। কোন স্ত্রী বিবাহ অস্বীকার করিতে পারে আর্য্যখণ্ডে—এইরূপ কোন সংবাদ তিনি জানেন না। সত্যই দ্বিধা হইল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? কে দিবেন পরামর্শ? পিতা মহর্ষি অঙ্গীরা দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—এই বিবাহ ভ্রষ্ট বিবাহের অন্তর্গত কিনা। চিন্তিত হৃদয়ে মহর্ষি স্থানত্যাগ করিলেন। অভিসম্পাত বা স্ত্রী ত্যাগের কোন কথা তাহার মনে উদয় হইল না।

সেদিন প্রভাতকাল। স্নানার্থে জ্যোৎস্নাকালী নদীতটে গিয়াছে। অন্যান্য ঋষিবালাগণ স্নান ও কলহাস্যে প্রভাতকালকে মুখরিত করিতেছে। জ্যোৎস্নাকালী নদীতে অবগাহনের জন্য নামিবামাত্র সলিলগর্ভ হইতে একটি হিরণ্ময় রথ উত্থিত হইল। তাহাতে বরুণদেব অধিষ্ঠিত। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সোমকন্যাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রথে স্থাপন করিলেন—ক্ষণকাল পরে রথ পুনরায় সলিলগর্ভে অন্তর্হিত হইল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ঋষিকন্যাগণ স্নান অসমাপ্ত রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া মহর্ষিকে এই অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় মহর্ষি কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। যোগবলে জলজন্তু সঙ্কুল লবণাম্বুরাশি ভেদ করিয়া বরুণালয়ে যাইবার সামর্থ্য তাঁহার আছে—কিন্তু তাঁহার মনে সংশয়—প্রকৃতই জ্যোৎস্নাকালী তাঁহার ধর্মপত্নী কি না? স্ত্রীর কঠোর যুক্তিপূর্ণ তিরস্কার তাঁহার হৃদয় বিচলিত করিয়াছিল। ঋষিবালাগণ বলিতেছে—সোমকন্যা বরুণদেবকে দেখিয়া উৎফুল্ল হয় এবং সাগ্রহে রথে আরোহণ করে।

তবে কি করণীয়? এমন সময় দেবর্ষি নারদ মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি যোগবলে বরুণালয়ে গিয়া সোমকন্যাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিব।"

কিন্তু দেবর্ষি ম্লানমুখে ফিরিলেন! বরুণদেবতা তাহাকে অপমান এবং গলহস্ত দিয়া বিদায় দিয়াছেন। ক্ষিপ্ত উদ্ধত বরুণদেব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, অভিসম্পাতের ভয় তাহার নাই। তিনি বলিয়াছেন—এক কামার্ত্ত বৃদ্ধের হাত হইতে তাহার বাগ্‌দত্তা পত্নীকে সে উদ্ধার করিয়াছে—সুতরাং অন্যায় অভিসম্পাত তাহাকে স্পর্শ করিবে না। মহর্ষির যোগবলকেও সে বিদ্রূপ করিয়াছে।

সোমকন্যা মহর্ষির প্রকৃতই ধর্মপত্নী কিনা সে বিষয়েও দেবর্ষির সংশয় আছে। শাস্ত্রের বিধানে কোন নির্দিষ্ট পথ নির্দ্দেশ নাই।

দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন।

ক্রোধে উতথ্যের সর্বদেহ কম্পিত হইতে লাগিল—তাহার তপস্যা ও যোগবলকে বরুণদেব তুচ্ছজ্ঞান করেন! তাহার তপোবলের পরীক্ষা হইবে আজ।

ক্রুদ্ধ মহর্ষি সাগরতটে উপনীত হইয়া তাহার তপস্যাসঞ্চিত অসীম যোগবল প্রয়োগ করিলেন। মস্তক হইতে একটি তীব্র জ্যোতি সমুদ্রতরঙ্গ স্পর্শ করিল। মুখবিবর বিশালাকৃতি ধারণ করিল। সাগর হইতে অসীম জলরাশি জলস্তম্ভরূপ ধারণ করিয়া মুখবিবরে বিপুল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিশালাকৃতি হিংস্র জলজন্তু সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া মুখবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল—সে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্য। যোগবলের অসীম মহিমা দেখিবার জন্য স্তম্ভিত স্বর্গবাসী দেবগণ ঋষিগণ গগনতলে সমবেত হইলেন। দেখিতে দেখিতে বিশাল সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গেল। বরুণদেবের সুহৃৎগণ এই ভয়ংকর কার্য্যকলাপ দেখিয়া বারংবার সোমকন্যাকে প্রত্যার্পণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু বরুণদেব তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

মহর্ষি এইবার ধরিত্রীদেবীকে কহিলেন—দেবী! আমাকে বলুন বরুণদেবের অধিকৃত সাগরতলে লুক্কায়িত ছয় লক্ষ হ্রদ কোথায়? আমি তাহাদের জলশূন্য করিব—'আপনার হৃদয় আর্ত্ত হইলেও আমি নিরুপায়।' তপঃপ্রভাবে দেখিতে দেখিতে হ্রদসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল। তথাপি বরুণদেব অটল। এইবার মহর্ষি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—'লবণাক্ত সমুদ্রতলে সুমিষ্ট সুপেয় প্রবহমানা স্রোতস্বতী সরস্বতী নদী জলশূন্য হইয়া মরুদেশে অপসৃত হউক।'

সরস্বতী নদী মহর্ষির ইচ্ছায় পরিচালিত হইল।

এইবার বরুণদেব নিজেকে চরম বিপন্ন বিপদগ্রস্ত বুঝিলেন। সমগ্র বরুণালয় এবং রসাতল একমাত্র এই সরস্বতীর জলপান করে। তাঁহার দর্প চুর্ণ হইল, দ্রুত সোমকন্যাকে লইয়া তিনি মহর্ষির পদতলে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন।

মহর্ষি ভার্য্যাকে পাইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বরুণদেবের কাতর প্রার্থনায় হ্রদসকল জলপূর্ণ এবং সরস্বতী নদী পুনরায় প্রবহমানা করিলেন। মহর্ষির অসীম যোগপ্রভাব দেখিয়া ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইল।

গৃহকোণে বিচলিত বিমর্ষ সোমকন্যা—মহর্ষির অসীম তপঃপ্রভাবের

কাছে বরুণদেবের পরাজয় ও মার্জনাভিক্ষা তাহাকে ভিন্নমুখী করিয়াছে। এখন কি তাহার কর্তব্য সে জানে না। মহর্ষি তাহার সহিত কোন বাক্যালাপ করেন নাই। তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মার নিকটে গিয়াছেন কর্তব্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে।

মহর্ষি ফিরিয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা প্রকৃষ্ট উপদেশ দেন নাই—বলিয়াছেন শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কোন বিবাহরীতিই এই ক্ষেত্রে সঠিক প্রযোজ্য হয় নাই, সুতরাং কন্যার ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য। তিনি চিত্ত স্থির করিয়া আসিয়াছেন যোগবলে স্ত্রীকে কুমারীত্ব দান করিয়া বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে। অসুখী বিষন্ন সোমকন্যাকে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখা তাঁহার বিবেক সায় দিতেছে না।

গৃহকোণে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছে সোমকন্যা। স্বামী ফিরিয়াছেন সে জানে না। মহর্ষির লঘু পদধ্বনি শুনিতে পায় নাই···।

মহর্ষি ডাকিলেন—'সোমকন্যা! আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। তুমি কায়মনবাক্যে আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কর নাই। আমিও নিজের কার্যে একান্ত অনুতপ্ত। আমি যোগবলে তোমাকে কুমারীত্ব দান করিতেছি, তুমি বরুণালোকে ফিরিয়া যাও।'

বিহ্বল হয় সোমকন্যা জ্যোৎস্নাকালী। তাহার স্বামীর যোগপ্রভাব যে জগতে অদ্বিতীয় প্রমাণ পাইয়াছে—কিন্তু মহত্ব! তাঁহার এই হৃদয় অজানা ছিল। অন্যদিকে—বরুণদেবের উদগ্র কামনাকে সে আজ ঘৃণা করে।

সে সহসা মহর্ষি উতথ্যের পদতলে লুটাইয়া পড়ে, বলে—'প্রভু! আমি হতভাগিণী! আপনাকে এতদিন জানি নাই—বুঝি নাই আপনার আশ্রমের পবিত্রতার কাছে লালসাময় বরুণালোক তুচ্ছ—আমাকে ক্ষমা করুন।'

মহর্ষি সাদরে সোমকন্যার হস্ত ধারণ করেন, বলেন—'বেশ! তোমাকে আমার ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। তপঃপ্রভাবে আমার আশ্রমে তোমার কোন কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। আমি পরমপিতা ব্রহ্মার নিকট তোমার আমার ভবিতব্য জানিয়া আসিয়াছি। আমি শীঘ্রই দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে লীন হইব। আমার মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে যোগপ্রভাবে তুমি কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং ত্রিভুবনে সকলেই তোমার পূর্বকথা বিস্মৃত হইবে। আরও শোন, তোমার পিতা ও বরুণদেব

সাগরতল হইতে একই লগ্নে উদ্ভূত— সুতরাং জলদেবতা তোমার পিতৃতুল্য। পরমপিতা তোমার সহিত বরুণদেবতার মিলন অনুমোদন করেন নাই। পুত্র পিতার আত্মাস্বরূপ। তোমার মনোবাসনা পূর্ণের জন্য বরুণ-দেবতার পুত্র যুবরাজ পুষ্করের সহিত তোমার বিবাহ হইবে। তোমার সহিত মিলনস্মৃতি অক্ষয় রাখিবার জন্য পুষ্কর মরুদেশে এক বিশাল হ্রদ সৃষ্টি করিবে এবং তাহা অনন্তকাল সুমিষ্ট সুপেয় জলে পূর্ণ থাকিবে। মরুভূমির জ্বলন্ত দাবদাহ কোনদিন তাহা জলশূন্য করিতে পারিবে না এবং ঐ হ্রদ-তীর হইবে পরমপিতার পার্থিব আবাসস্থল। এই জলাশয় পুষ্করতীর্থ নামে শ্রেষ্ঠ মহাতীর্থে পরিণত হইয়া তোমার ও পুষ্করের মিলনস্মৃতিকে অক্ষয় রাখিবে।

উদাস নয়নে জ্যোৎস্নাকালী মহর্ষির দিকে চাহিয়া থাকে।

স্বাহা ও বৈশ্বানর

ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষদুহিতা স্বাহা। বিষণ্ণ চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ভগ্ন বিচূর্ণ বিধ্বস্ত যজ্ঞস্থলীর প্রান্তশেষে বসিয়া আছে স্বাহা। যাহাকে সে হৃদয় দান করিয়াছিল, যজ্ঞশেষে বরমাল্যদানে নিজেকে ধন্য মনে করিত সেই অগ্নিদেবতা বৈশ্বানর দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হইবামাত্র অন্তর্ধান করিয়াছেন। হয়তো সূর্যমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে আনিবার মন্ত্র স্বাহার জানা নাই···!

ঊনত্রিংশ ভগিনী তাহারা।

জ্যেষ্ঠা সতী পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছিলেন ভূতভাবন মহাদেবকে। যজ্ঞস্থানে স্বামীকে অপমানের জন্য তিনি অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

অপরূপ রজতদ্যুতিময় চন্দ্রদেবকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ সপ্তবিংশতি ভগিনী একযোগে তাহার কণ্ঠে বরমাল্য দান করিয়াছে। এই সংঘবদ্ধ বিবাহ স্বাহার ভাল লাগে নাই। এক স্বামী বহুপত্নীকে সমচক্ষে দেখিতে পারেনা—ইহাই স্বাহার ধারণা। সে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছে চতুর্থী রোহিণীর প্রতি চন্দ্রদেবের পক্ষপাতিত্ব এবং নবম দশম ভগিনী অশ্লেষা ও মঘার প্রতি বিমুখতা। ভগিনীদের ভিতরে স্বামী-অনুরাগ লইয়া ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব।

যাক সে কথা···। স্বাহার চিন্তা অন্য। ব্রহ্মাপ্রদত্ত মন্ত্রশক্তি বলে সূর্য-দেহসংলগ্ন বৈশ্বানরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে অনল দেবতার এই প্রথম আবির্ভাব। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের লেলিহান আকাশচুম্বি শিখার ভিতরে বৈশ্বানরের মহাজ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়া স্বাহা মুগ্ধ। প্রথম আবির্ভাবে দেবতার চক্ষেও বিস্ময়। যদি বরমাল্য দিতে হয় তবে মহাতেজা অগ্নিদেবতাকেই সে দিবে।

স্বাহা লক্ষ্য করিয়াছে—ক্ষণে ক্ষণে দেবতার দৃষ্টি পতিত হইতেছে যজ্ঞস্থলে সমাগতা ব্রহ্মাসম্ভূত সপ্তর্ষির পত্নীদের অপূর্ব কান্তিময়ী দেহসুষমার প্রতি। সেই দৃষ্টির ভাষা স্বাহা জানে এবং জানে বলিয়াই সে চিন্তিত ও বিষণ্ণ।

কিন্তু কোথায় বৈশ্বানর? আসক্তি-পীড়িত হৃদয়ে তিনি পুনরায় সূর্যালোকে ফিরিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

প্রজাপতি দক্ষের দুহিতা স্বাহা। দেব অংশের অধিকারিণী। তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল নিকটস্থ হিমালয়ের পাদমূলে পুষ্পকানন শোভিত সপ্তর্ষির আশ্রম। তাঁহারা সহধর্মিণীদের লইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া মহাযজ্ঞে রত। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হইবার অকল্যাণ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষি—বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, মরিচী, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ও ক্রতু, এবং তাঁহাদের পত্নিগণ ব্রহ্মার মানসকন্যা অরুন্ধতী, শিবা, শুভা, অনসূয়া, আত্রেয়ী প্রভৃতি। পরম ভক্তি, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞানলে আহুতি দিতেছেন ঋষিগণ এবং পত্নীগণ করিতেছেন উপাচার দানে সর্ব সহায়তা।

স্বাহা ধীরপদে প্রবেশ করে যজ্ঞস্থলে। তীক্ষ্ন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাহার। না—ভুল নয়, ঐ দেখা যায় যজ্ঞানলে বৈশ্বানরের প্রচ্ছন্ন লোভাতুর দৃষ্টি। অপলক নেত্রে ঋষিজায়াগণের রূপমাধুরী পান করিতেছেন। তিনি সকলের কাছে অদৃশ্য কিন্তু স্বাহার সন্ধানী দৃষ্টির অগোচরে নিজেকে রাখিতে পারেন নাই।

স্বাহা আরও লক্ষ্য করে বৈশ্বানরের গতিবিধি। রন্ধনশালায় রন্ধনরতা ঋষিজায়াদের অসম্বৃত বেশবাস। সেখানেও গুপ্তভাবে অনল দেবতা। সেই নির্নিমেষ দৃষ্টি লোভাতুর কামাতুর মোহগ্রস্ত হুতাশনের উপস্থিতি জানিতে পারেন নাই তাঁহারা! শাপগ্রস্ত হইবার ভয়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন অনল দেবতা…।

স্বাহার মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দৃষ্টি আকর্ষণের সকল চেষ্টাই তাহার ব্যর্থ। অপরূপ যৌবনবতী অসামান্যা সুন্দরী সে। পুরুষকে আকর্ষণের সর্ব উপাচারে তাহার দেহবল্লরী সজ্জিত। ঋষি-জায়াগণের মাদকতাশূন্য সৌম্য দেহে যৌবন বিগতপ্রায়। তাঁহাদের প্রতি বৈশ্বানরের এই মোহগ্রস্ততা কেন, তাহা স্বাহা বুঝিতে পারে না। তবু…

তবু বৈশ্বানরকে এই দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। নিষিদ্ধ আকর্ষণ তাহার নিজের উপর ফিরাইতে হইবে; নতুবা অনল দেবতার মুক্তি নাই। যদি কোনক্রমে সর্বজ্ঞ ঋষিগণ বৈশ্বানরের এই পরদার আসক্তির কথা জানিতে পারেন তবে তিনি হইবেন ভীষণ অভিশাপগ্রস্ত। এই আসন্ন বিপদ হইতে তাহার অন্তরপ্রিয়কে রক্ষা করিতে হইবে। কি উপায়ে?

যজ্ঞ শেষ হইয়াছে। অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত। কিন্তু কোথায় বৈশ্বানর—স্বাহা তাহা জানে। রন্ধন শেষে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডে তুষানল রক্ষিত করিয়া ঋষিজায়াগণ নিদ্রাবিভূতা। অনলশিখায় প্রচ্ছন্ন থাকিবার স্থান নাই, তাই বৈশ্বানর নিকটস্থ বনভূমিতে আশ্রয় লন নিশা সমাগমে। শুষ্ক পত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া করেন অবস্থান। মানসে ভাসিয়া উঠে ঋষিজায়াগণের দেহসুষমা—অরুন্ধতী, শিবা, শুভা, আত্রেয়ী, অনসূয়া; কে বেশী যৌবনবতী, কে বেশী মোহময়ী তৃপ্তিদায়িণী…… !

পত্র মর্মরে শোনা যায় কাহার পদক্ষেপ? কে যেন এই দিকেই আসিতেছে? শুষ্ক পত্র প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছেন অনলদেবতা বৈশ্বানর। হৃদয়ের দহনজ্বালায় দেহ ও মন উত্তপ্ত। এই সঙ্গোপন স্থানে কাহার আগমন? ঐ কে আসে নারীমূর্তি ফুলসাজে সজ্জিতা, খুলিয়া ফেলে অবগুণ্ঠন। কে—কে ঐ অভিসারিকা… ?

বিস্ময়ে বৈশ্বানরের কণ্ঠে বাহির হয়—শিবা তুমি !

হ্যাঁ, আমি অঙ্গিরা-ভার্যা শিবা। আমায় তুমি গ্রহণ কর অনলদেবতা বৈশ্বানর, আমি তোমাতে অনুরক্তা।

বিস্মিত উল্লসিত অগ্নিদেবতা সাগ্রহে করেন তাহার হস্তধারণ! আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে আমি তোমাতে অনুরক্ত ?

যজ্ঞশালায় রন্ধনাগারের অগ্নিশিখায় তোমার প্রচ্ছন্ন অবস্থান আমার অগোচর ছিল না। তাই নির্জন বনভূমে আমার অভিসার—বলে ছদ্মবেশিণী স্বাহা।

পরম তৃপ্তিতে কাটিয়া গেল রজনী। প্রভাত সমাগমে স্বাহা উঠিল। সমগ্র দেহে যেন দাবদাহ। অনলদেবতার মহাতেজ গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার নাই। সে কুমারী—লোকলজ্জাভয় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

গারুড়ী পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া চলে দেব অংশসম্ভূতা স্বাহা। জাহ্নবী সলিলে অগ্নিতেজ সে করে সঞ্চারিত—তারপর পুণ্যতোয়ায় অবগাহন করিয়া দেহকে করে শীতল। আজ সে তৃপ্ত। সে তাহার দয়িতকে একান্ত ভাবে পাইয়াছে! কিন্তু এই ছদ্মরূপ যদি প্রকাশিত হয় ?

পরদিন নিশাসমাগমে স্বাহা আবির্ভূতা হয় বনভূমিতে অত্রিপ্রিয়া অনসূয়ার ছদ্মবেশে। তৃপ্ত হয় তাহার কামনা, তৃপ্ত হন অনলদেবতা।

পুনরায় গারুড়ী রূপ ধারণ করিয়া জাহ্নবী সলিলে অগ্নিতেজ সঞ্চারিত এবং অবগাহনে দেহকে করে স্নিগ্ধ ও নির্মল।

এইরূপ পর পর ছয় রাত্রি ঋষিপত্নীদের ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া তৃপ্ত করে নিজের কামনা। তৃপ্ত করে অনলদেবতাকে। সপ্তম রাত্রিতে তাহার প্রচেষ্টা হয় ব্যর্থ। বশিষ্ঠপ্রিয়া অরুন্ধতীর অবিচলিত একনিষ্ঠ স্বামী ভক্তি ও অসীম সতীতেজের কাছে সে হয় পরাজিত। সে কিছুতেই অরুন্ধতীর কামার্তা অভিসারিকারূপ ধারণ করিতে পারে না। তবু যাইতে হয়… !

চমকিত বিস্মিত হন বৈশ্বানরঃ কে তুমি! তুমিতো অরুন্ধতী নও। তাঁহার প্রতিটি দেহরেখা, রক্তরাগ রঞ্জিত অধর, সমুন্নত বক্ষশোভা সবই আমার জ্ঞাত। তুমি সে নও! সত্য বল কে তুমি ?

ক্রুদ্ধ বিস্মিত অনলদেবতার পদতলে লুটাইয়া পড়ে দক্ষদুহিতা স্বাহা, নিবেদন করে তাহার ব্যর্থপ্রেম—গোপন অভিসারের কাহিনী।

আমাকে পত্নীরূপে—সেবিকারূপে গ্রহণ কর দেবতা। আমি তোমাতে অনুরক্তা, আমার অপরাধ মার্জনা কর…কাতরস্বরে বলে স্বাহা।

'তুমি দুশ্চরিত্রা, স্বৈরিণী! তোমাকে ধিক্—তোমাকে পত্নীত্বের মর্যাদা দিতে পারিনা—দূর হও!'—গর্জন করিয়া উঠেন দেবতা বৈশ্বানর।

অপমান, লাঞ্ছনা, ব্যর্থপ্রেম সব হাহাকারে এক হইয়া যায়। সজল চক্ষে আবেগক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধীর পদে অগ্রসর হয় জাহ্নবীর পুণ্যতোয়ার দিকে। সে সলিলে নিজেকে চিরমগ্ন করিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত দেহত্যাগ করিবে। এই অভিশপ্ত ব্যর্থ দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

দৃশ্যান্তরে সংঘটিত হইতেছে পরম নাটকীয় ঘটনাবলী। রুদ্রদেব পুত্রার্থে আপনার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন অগ্নিতে। স্বাহা পর পর ছয়বার রুদ্রশক্তি সঞ্চারিত অগ্নিদেবতার মহা তেজোময় শক্তি জাহ্নবী সলিলে সঞ্চালিত করিয়াছে। দেবী জাহ্নবী সেই মহাশক্তি ধারণে অশক্ত হইলেন। কৃত্তিকাদি ছয়জন বিবাহিতা নারী জাহ্নবী সলিলে অবগাহন করিতেছিলেন। গঙ্গাদেবী নিজের ঐশী শক্তিবলে সেই মহাশক্তি নারীগণের গর্ভে সঞ্চালিত করিলেন। দেবমায়ায় বিস্মিত বিচলিত নারীগণ তৎক্ষণাৎ পূর্ণগর্ভবতী হইয়া গর্ভযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিকটস্থ শরবনে প্রত্যেকে শিশুর এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসব করিলেন। স্তম্ভিত বিস্মিত মাতৃগণ ঐ দেহখণ্ডগুলি একত্র করিবামাত্র

এক অপূর্ব কান্তিময় দেবশিশুর জীবন্ত আকৃতি প্রাপ্ত হইল। বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! ঐ শিশু ষড়ানন হইয়া ষণ্মাতার স্তন্যপান করিয়া ঐ ছয়জনকেই সমভাবে মাতৃমর্য্যাদা দান করিল।

কৃত্তিকাদি ষণ্মাতার গর্ভজাত বলিয়া কুমারের নাম হইল কার্ত্তিকেয়। স্কন্নশক্তি (স্কন্ন-অর্থ—অব্যর্থ) হইতে উৎপন্ন বলিয়া অপর নাম স্কন্দ। শরবনে জন্ম বলিয়া নাম হইল শরদ্বান।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কলেবর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! শিশু হইতে বালক—বালক হইতে কিশোর—শেষে মহাশক্তিমান অপূর্ব দ্যুতিময় যুবক!

স্বর্গে বাজিল দুন্দুভি। ইন্দ্রদেব প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন। শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া দেবগণসহ শরবনে উপনীত হইলেন নব যুবককে অভিনন্দন ও আবাহনের জন্য। জানিলেন নব শিশু ভগবান রুদ্রদেব ও অগ্নিদেবতার মিলিত শক্তি সঞ্জাত হইয়া জন্মিয়াছে দৈত্যাসুর বিনাশনের জন্য। দুর্জয় মহিষাসুর এবং তারকাসুর হইবে ইহার হস্তেই নিধন—দেবগণ হইবেন নিষ্কণ্টক!

কিন্তু নবকুমার কার্ত্তিকেয় খুঁজিতেছে তাঁহার ধাত্মাতা স্বাহাকে। সে কোথায়?—তাহারই অভিসারে সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্ম! সে পরিশোধ করিবে মাতৃঋণ? কোথায় সে…!

নৈরাশ্য, ক্ষোভ, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় দেহ বিসর্জনের জন্য ধীরপদে জাহ্নবীতীরে উপনিত হয় স্বাহা…এইবার পুণ্যতোয়াতে ঝাঁপ দিয়া তাহার জীবনের জ্বালা জুড়াইবে, এমন সময় সলিল হইতে উঠিয়া আসিলেন দেবী জাহ্নবী।…

বলিলেন—'ধন্য তুমি…অপেক্ষা কর দক্ষদুহিতা স্বাহা। তোমার জীবন সার্থক। তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে রুদ্র-বৈশ্বানর মিলিত শক্তি জঞ্জাত কুমার কার্ত্তিকেয়। ত্রিভুবনে সে অজেয় দৈত্য অসুরকুল বিনাশন ভবিষ্যৎ দেবসেনাপতি। সেই কুমার আকুলভাবে ধাত্রীমাতাকে প্রণাম করিবার জন্য সন্ধান করিতেছে।'

বিস্মিত পুলকিত চিত্তে স্বাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় অদূরে দেব-মানবের বিশাল সমাবেশের প্রতি। ধীর পদে অগ্রসর হয় সে।

সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে নবকুমার প্রদীপ্ত হাস্যে বলে—"বল মাতা, কি তোমার প্রার্থনা?"

সংকোচে স্বাহার জিহ্বা হয় আড়ষ্ট। আনন্দে নয়নদ্বয় হয় সজল। হৃদয়ে জাগে আবেগ আকুলতা। স্বাহা বাক্যহীনা।

মৃদু হাস্যে বলে কুমার—'মাতা! তোমার ভাষাহীনা মুখের বাণী আমার অজ্ঞাত নয়। তোমারই জন্য আমার জন্ম সম্ভব হইয়াছে। আমি বরদান করিতেছি—অনল দেবতা বৈশ্বানর তোমাকে সপত্নীহীন সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিবেন। আমার বরে প্রতি যজ্ঞাহুতিতে এক নিঃশ্বাসে অগ্নির সহিত স্বাহার নাম উচ্চারণ না করিলে সেই যজ্ঞ হইবে নিষ্ফল।

আনন্দে ভরিয়া উঠে স্বাহার হৃদয়। আবেগে নিরীক্ষণ করে পুত্রকে। বিচলিত বিহ্বল হৃদয় দেহভার সহ্য করিতে পারে না, দেহ লুটাইয়া পড়ে ভূমিতলে। ···না, ভূমিস্পর্শ করে না দেহ। কে যেন সবল বাহুবন্ধনে স্বাহাকে করে আলিঙ্গন। কণ্ঠে তাহার আকুল আবেগভরা ভাষা: 'স্বাহা ধন্য আমি। তোমারই অভিসারে পরম গুণসম্পন্ন এই পুত্রের জন্ম। আমায় ক্ষমা কর স্বাহা, তুমি আমার—আমি তোমার।'

বৈশ্বানরের বক্ষলগ্না স্বাহার কণ্ঠে বাহির হয় অস্ফুটবাণী,—আমি ভাগ্যবতী!

———



তপতি ও সম্বরণ

জ্যোর্তিময়ী! তুমি দাঁড়াও—তুমি দেবী না মানবী জানিনা, কুমারী কি ভর্তৃকা জানিনা, আমার আহ্বানে সাড়া দাও—যেওনা।

অনুরাগ ভরা এই আহ্বান শুনিয়াও হাসিয়া পর্বতের অন্তরালে অন্তর্হিতা হয় যেন এক বিদ্যুৎ লতা। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন মহারাজ সম্বরণ। এ দেবী না মানবী, গন্ধর্ব না কিন্নরী? কে এ!

ঋক্ষনন্দন পরম ভট্টারক সূর্য উপাসক মহারাজ সম্বরণ। মনোমত কন্যার অভাবে আজও তিনি অকৃতদার। এক অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী স্নিগ্ধা মানসী কল্পনায় রূপায়িত করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, সে নারী মূর্তিমতি হইয়া আজিও তাঁহার নয়নগোচরে আসে নাই। কল্পনাকে তিনি হৃদয়ে অবিকৃত রাখিয়াছেন। মাতা, বান্ধব, এমনকি গুরু বশিষ্ঠের শত উপরোধেও তিনি বিবাহ করেন নাই। বয়স ত্রিংশ উত্তীর্ণপ্রায়, তবুও তিনি রাণীহীন রাজা—ভারতভূমিতে দৃষ্টান্তহীন এক অবাস্তব কল্পনায় নিমগ্ন।

রাজকার্য্যের অবকাশে বনবিহার ও মৃগয়াযাত্রা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। এইবার হিমালয়ের গহণ অরণ্যে অশ্বারোহণে মৃগের প্রতি ধাবমান হইয়া অনুচরবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। অশ্বকে পূর্বেই এক বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখন দিগভ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন। সন্ধ্যা সমাগত। অবিলম্বে না ফিরিলে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে বিপদ অনিবার্য্য—আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, নক্ষত্রখচিত মহাকাশ দেখিয়া দিকনির্ণয় করা আর সম্ভব নয়। উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পর্বতের এক পরিষ্কার বৃক্ষশূন্য সানুদেশে উপস্থিত হইলেন রাজা।

ধনুর্বান হস্তে লইয়া কোন পর্বতগুহার সন্ধান করিতেছেন এমন সময় দেখা দিল বিদ্যুৎ প্রভার মত ঐ অসামান্যাকে! সে সম্বরণের দিকে চকিত মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া পর্বতের অন্তরালে মিলাইয়া গেল—সম্বরণ দেখিলেন তাঁহার অধরে ঈষৎ হাস্য, নয়নে হরিণীর কটাক্ষ! এ হাসি তাহার জানা—এ কটাক্ষ প্রণয়রঞ্জিত! কিন্তু কে ঐ নারী? কোথায় গেল!

বিহ্বল অবসন্ন মহারাজ পর্বতসানুদেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাতে হয় মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ। বিস্মিত মহারাজ স্মরণ করেন বিগত সন্ধ্যার স্মৃতি। পর্বতের সানুদেশে তিনি শয়ান রহিয়াছেন। মস্তকে তৃণপত্রের উপাধান, দেহে অবসন্নতার লেশমাত্র নাই। কখন মূর্চ্ছাভঙ্গ ও পরে মূর্চ্ছাভঙ্গে নিদ্রিত হন তাহা বিস্মরিত—শুধু পরিপূর্ণ স্মরণে আছে সেই অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ীর কথা। তাহার পর রাত্রি কাটিয়াছে, হিংস্র শ্বাপদেরা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, কখন গভীর সুসুপ্তি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কেমন করিয়া দেহের সর্বগ্লানি দূরীভূত হইয়াছে—সে এক বিস্ময়! চোখ মেলিয়া চাহিতেই তাঁহার কর্ণে পশিল রমণীকণ্ঠের বীণানিন্দিত স্বর—'কেমন আছেন মহারাজ সম্বরণ? আশা করি এখন সুস্থ ও সবল?'

চমকিত হন মহারাজ। উঠিয়া বসেন। অদূরে দেখেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। এ তো সেই…চকিতে মিলাইয়াছিল পর্বতের অন্তরালে……

রমণী কহিল, 'মহারাজ! আমি আপনাকে জানি। আপনি দিনকরের পরম ভক্ত। প্রভাতে সূর্যবন্দনা পূজা আপনার নিত্যকর্ম। ঐ অদূরে হস্তপদ প্রক্ষালনের সুশীতল প্রস্রবণ! সম্মুখে ফলভারে অবনত সমৃদ্ধ কানন। ঐ অদূরে পর্বতগাত্রে স্বাভাবিক গুহা। আপনি প্রাতঃকর্ম সমাপন করুন। আমার প্রদত্ত দিব্য ঔষধে আপনার দেহের গ্লানি ও মালিন্য দূর হইয়াছে, নিশাকালে আপনার পুণ্যফল আপনাকে হিংস্র শ্বাপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। অগ্নিকোণে কিছুদূর যাইলেই আপনার অশ্বকে দেখিবেন; অশ্বই আপনাকে পথ চিনাইয়া স্কন্ধাবারে পেঁছাইয়া দিবে। আমি এখন আসি মহারাজ!'

'না—না, বল কে তুমি'—বিস্ময় বিমূঢ় মহারাজ প্রশ্ন করেন—'তোমার কি পরিচয়—দেবী না মানবী, অপ্সরা না কিন্নরী, কে তুমি?'

রমণীর হস্তধারণ করিতে অগ্রসর হন মহারাজা; কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সে পিছাইয়া যায়।

যথাশক্তি মহারাজ তাহার পিছু ছুটিলেন—কিন্তু এক অলৌকিক শক্তি বলে হাস্যমুখরিতা বালা সমদূরত্ব রাখিয়া পিছাইতে লাগিল। বিস্মিত রাজা হতাশ হইয়া থামিলেন।

হাসিয়া রমণী বলিল—'মহারাজ সম্বরণ! আমি অনূঢ়া। অসুস্থ জ্ঞানশূন্য পুরুষকে স্পর্শ করা দেবধর্ম। কিন্তু এখন আপনি কলুষমুক্ত

সুস্থদেহী, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। যদি দূরত্ব দূর করিতে চান তবে সূর্যদেবকে তুষ্ট করুন, আত্মসংযম দ্বারা চিত্তকে উদ্ভাসিত করুন—তাহা হইলে আমাকে পাইবেন, জানিয়া রাখুন আমি আপনাতে অনুরক্তা।'

রমণী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত পর্বতের অন্তরালে অন্তর্হিতা হইল। বিস্মিত মহারাজা সেই পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার প্রতি ধাবিত হইবার সর্বশক্তি লুপ্ত হইল। মহারাজ সম্বরণ তদগত চিত্তে সেই রূপরাশি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে দেবী, অসুর কুমারী, যক্ষ বালা, অনার্য্যা গন্ধর্বকুলজা, কিন্নরী বা মানবী কোন্ কুলোদ্ভবা? এই অঙ্গনা রূপের অপূর্ব তেজপুঞ্জপ্রভায় একে হুতাশন তনয়া এবং প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধতায় একে কমলাসনা লক্ষ্মী বলিয়া বিভ্রম হয়!

রমণী স্বীকার করিয়া গেল যে তাহার প্রতি সে অনুরক্তা। কিন্তু তাহার অন্তর্হিতা হইবার রহস্য মহারাজা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। রমণীর উপদেশ, সূর্যোপাসনা সকলি বিস্মৃত হইয়া অনন্যমনা হইয়া তিনি উহার রূপচিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজপুরে ফিরিবার কোন প্রচেষ্টাও করিলেন না।

দিন কাটিল। দিনমনি পশ্চিম গগনে অস্তমুখী হইলেন। সহসা সেই মধুর কণ্ঠ শোনা গেল: 'মহারাজ আপনি আজ সূর্যোপাসনা করেন নাই। দিনকর অস্তাচলমুখী। এখনও সময় আছে। জানিবেন সূর্যদেবকে তুষ্ট করাই আমাকে পাইবার একমাত্র উপায়।"

অধীর কণ্ঠে বলিলেন সম্বরণ—'কে তুমি জানিনা, সত্য পরিচয় দাও। তুমি যেই হও, তোমাকে ভালবাসিয়াছি, আমার জীবনে তুমিই প্রথমা। এসো, গন্ধর্বমতে আমরা বিবাহ করি। তুমি হইবে মহারাণী—প্রজাকুলের মাতৃসমা।"

মধুর কণ্ঠে হাসিয়া উঠে বরাঙ্গনা। বলে—'মহরাজা আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা। গন্ধর্ব-বিবাহ স্বচারিনীরই নামান্তর, দেব মানব কোন কুলই ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া গণ্য করে না এবং আমি ইহাতে সম্মতি দিতে পারিনা। আপনি স্মর-শর জর্জরিত জ্ঞানশূন্য। চিত্তকে নির্মল পবিত্র করুন। সূর্যোপাসনা করিয়া পিতাকে তুষ্ট করুন।'

'কে তোমার পিতা পরিচয় দাও। এখুনি তাঁহার নিকটে গিয়া তোমাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাই।'

এইবার বক্র কটাক্ষে বলে বালা, 'আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া জানিতাম। আমি দেবীবংশ সম্ভূতা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন। আমি সূর্যকন্যা তপতী, দেবী সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী। পবিত্রতাই আমাদের ধর্ম।'

তপতী কোমল কটাক্ষে সম্বরণের অন্তরকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অন্তর্হিতা হইল।

মহারাজ সম্বরণ মৃগয়া করিতে বাহির হইয়া অনুচরবৃন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হিমালয়ের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভীত অনুচরগণ সন্ধানে ব্যর্থ হইয়া নগরে রাজমন্ত্রীকে দুঃসংবাদ দান করিল। রাজগুরু বশিষ্ঠদেব যোগবলে পথনির্দেশ দান করিলে পিতৃসখা রাজমন্ত্রী স্বয়ং অনুসন্ধানে বাহির হইয়া অরণ্যমধ্যে ম্লানমুখে উপবিষ্ট সম্বরণকে দেখিতে পাইলেন।

এইরূপ চিত্তবৈকল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সম্বরণ পিতৃপ্রতীম রাজমন্ত্রীকে সকল কথা বিবৃত করিলেন। জানাইলেন তিনি এখন নগরে ফিরিবেন না। সূর্যদেবকে তুষ্ট করিয়া তপতী লাভ তাঁহার একমাত্র কাম্য। তাহাকে না পাইলে তপস্যায় জীবন বিসর্জন দিবেন। তিনি একাকী থাকিতে চাহেন। পরিচারকবৃন্দ উপস্থিত থাকিলে মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটিবে।

রাজমন্ত্রী অনুচরদের ফিরাইয়া দিলেন। সঙ্গে রাখিলেন হিংস্র শ্বাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ধনুর্বান, ভল্ল, মুষল প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্র এবং পুত্রতুল্য সম্বরণকে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় সংকল্পে মহারাজা বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তপস্যার বিধিনিয়ম শিক্ষা করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যায় বৃত হইলেন।

দিন কাটিতেছে। তাঁহার একাগ্র তপস্যায় সূর্যদেব প্রীত হইলেন। কিন্তু সৌরমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া আবির্ভূত হইলেন না। তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনায় সম্বরণের দেহ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে লাগিল। এমন সময় রাজগুরু বশিষ্ঠদেব যোগবলে ওই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় সম্বরণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপস্যায় রত এবং তাঁহার মস্তক হইতে একটি জ্যোতিরেখা উদিত সূর্যের অভিমুখে ধাবিত। বুঝিলেন সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তবে কেন দেবতা এখনও অকরুণ! চিত্ত স্থির করিয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবঅংশ সংভূত মহর্ষি যোগবলে উত্থিত হইয়া তেজমণ্ডল অতিক্রম করিয়া দিনকরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সূর্যদেব বশিষ্ঠদেবের আগমনের হেতু জানিয়া কহিলেন—'সম্বরণ আমার পরম ভক্ত এবং তাহাকে জামাতারূপে পাইবার ইচ্ছা আমার

অনেক দিনের। কিন্তু সে মানব এবং আমি দেববংশ সম্ভূত। এই প্রতিলোম বিবাহ কন্যার পূর্ণ সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়। আমার ইঙ্গিতে তপতী মর্তলোকে উপস্থিত হইয়া হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে পথহারা সম্বরণের সাক্ষাতে উপস্থিত ও তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। এখন সংবরণের আন্তরিকতা ও প্রেমের পরীক্ষা চলিতেছে। তাহার তপস্যায় ও নিষ্ঠায় আমি পরিতুষ্ট।'

সূর্যদেব আরও কহিলেন—'মর্তমানব সম্বরণ সূর্যমণ্ডলের তেজ সহ্য করিতে পারিবেনা—তাই তাঁহাকে এখানে আমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আপনি ঋষি শ্রেষ্ঠ! এক্ষেত্রে তপতীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে চাই। আপনি আমার প্রতিভূরূপে তাহাকে লইয়া সম্বরণের সম্মুখে গমন করুন এবং যথাশাস্ত্র বিবাহ দিন।'

বশিষ্ঠদেব তপতীকে লইয়া হিমালয়ের সানুদেশে সম্বরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাহ্যজ্ঞান শূন্য সমাধিস্থ মহারাজ তাহাদের উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিলেন না। বশিষ্ঠদেব তপতীকে সম্মুখে রাখিয়া মৃদু হাস্যে সম্বরণের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।

তপতী সম্বরণের দিকে চাহিলেন। কৃচ্ছসাধনে তাহার দেহ শীর্ণ মলিন। দিব্যদৃষ্টিতে সম্বরণের অন্তস্থল পর্যন্ত দৃশ্যমান হইল—সেখানে প্রতিভাত তপতীর হাস্যময়ী মুখমণ্ডল। সম্বরণের হৃদয়ে তপতী চিরস্থায়ীরূপে বিরাজিত।

বশিষ্ঠের স্পর্শে সম্বরণের সমাধিভঙ্গ হইল। চাহিয়াই চমকিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে ব্রীড়াবনতা দ্যুতিময়ী সূর্যকন্যা তপতী—হস্তে মন্দার পুষ্পমাল্য।

বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন সম্বরণ—'তপতী তুমি! তোমার পিতা কি পরিতুষ্ট? তিনি কি দিবেন তোমার বরমাল্য গ্রহণের অধিকার?'

মধুর হাস্যে তপতী সম্বরণের কণ্ঠে মন্দার পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 'যোগবলে জানিয়াছি সূর্যতেজ সঞ্চারিত অমিতবীর্য এক পুত্র জন্মিবে তোমাদের—তাহার নাম হইতে হইবে কুরুবংশের উদ্ভব। যত দিন ভারত কীর্তিগাথা মানবের হৃদয়ে বিরাজ করিবে ততদিন তপতীলাভে সম্বরণের সাধনা ও সিদ্ধির কথা সর্বলোকে ঘোষিত হইবে।'

তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল উভয়ের মুখমণ্ডলে।

———

চ্যবন ও সুকন্যা

অযোধ্যা নগরীর অনতিদূরে এক বিশাল বনভূমিতে প্রমোদবিহারে আসিয়াছেন অযোধ্যাপতি মহারাজ শর্য্যাতি। মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য রাজধানী ছাড়িয়া আত্মীয়-পরিজনসহ এই স্থানে পরিভ্রমণ করিতে আসেন, ইহা তাঁহার বিশেষ বিলাস··· !

এটি তাঁহার সংরক্ষিত বনভূমি। মাঝখানে বিশাল স্বচ্ছ সরোবর— তাহাতে অজস্র মরাল-মরালী বিহার করিতেছে···চারিপার্শ্বে বৃক্ষশাখায় অগণিত বিহঙ্গের কলকাকলি ! নানা বর্ণের হংসমিথুন চকোরচকোরীর ক্রীড়া দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। ভুলিয়া যান কর্তব্যভারাক্রান্ত রাজকার্যের দায়িত্ব। ভুলিয়া যান বার্ধক্যের দেহভার ! চপল শিশুর মত তিনি ঘুরিয়া বেড়ান বনভূমির কুঞ্জে কুঞ্জে ! বনভূমি হিংস্র জন্তুশূন্য করা হইয়াছে···পিতার কাল হইতে নানা জাতীয় মৃগ-শশক-বানর-ময়ূর-ময়ূরীর নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছে !

মহারাজ শর্য্যাতি এই অরণ্যভূমি আরও মনোরম করিয়াছেন নানাবিধ ফলবান পুষ্পশোভিত বৃক্ষ রোপন করিয়া। উদ্দেশ্য—বার্দ্ধক্যে সংসারাশ্রম ছাড়িয়া প্রজাগণ যাহাতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া এই নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ভগবৎ সাধনায় রতী হইতে পারেন। খাদ্য-পানীয়ের কোন কিছুর অভাব যেন ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে না পারে। এটি রাজধর্ম—তাহা পালনের কোন শৈথিল্য যদি হয়—তাই প্রমোদভ্রমণের নামে মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসেন। প্রয়োজনে তপোবন নির্মাণ করাইয়া দেন অশক্ত বানপ্রস্থী আশ্রমবাসীদের !

সঙ্গে আছে সৈন্যসামন্ত আত্মীয়পরিজনসহ ষোড়শী কন্যা সুকন্যা।

সখিদের লইয়া চঞ্চলা হরিণীর মত সুকন্যা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রাজোদ্যানের কৃত্রিম শোভা ছাড়িয়া প্রকৃতির কোলে আজ নিজেকে বিলাইয়া দিতে চান ! এ আনন্দ জীবনের ! মানবপ্রকৃতির নিভৃত মিলনের চিরন্তনী সুরছন্দ !

বিচরণ করিতে করিতে বনভূমির অভ্যন্তরে রাজকুমারীর দৃষ্টি পড়িল একটি অদ্ভুত পদার্থের প্রতি। একটি উচ্চ বল্মীক-স্তুপ···তাহার মধ্য দিয়া দুটি উজ্জ্বল পদার্থ খদ্যোতের মত দেদীপ্যমান। কৌতুহলী রাজকুমারী

একটি কণ্টক লইয়া একটিকে বিদ্ধ করিলেন। স্তূপটি একবার যেন কম্পিত হইল। বিস্মিত রাজকুমারী সখিদের লইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। সুমিষ্ট ফল আহরণ—বনপুষ্প চয়নের অপার আনন্দে তাঁহার হৃদয় তখন উত্তাল!

সন্ধ্যা সমাগমে মহারাজ শর্য্যাতি প্রাসাদে ফিরিলেন। সঙ্গে প্রচুর স্কন্দাবার ছিল। তাহা দিয়া বস্ত্রকক্ষ নির্মাণ করিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হইল। হিংস্র জন্তুশূন্য বনভূমিতে আতঙ্কের কোন কারণ নাই। রাজকন্যা সুকন্যা সখিদের লইয়া স্কন্দাবারে আশ্রয় লইলেন…! অরণি-কাষ্ঠ জ্বালিয়া বিশ্রম্ভালাপে নিশাজাগরণের অপার আনন্দ সকলেই পাইতে চায়—কচিৎ এরূপ সুযোগ আসে।

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে প্রতিটি প্রাণী অসুস্থ। নিয়তির এক অলক্ষ্য নির্দ্দেশে শৌচকার্য বন্ধ। প্রতিজন প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করিল—দেখা গেল নৃপতি হইতে সামান্য প্রহরী পর্যন্ত বিপর্যস্ত। কোনরূপ অখাদ্য কুখাদ্য কেহ খায় নাই। সদ্যহত মৃগমাংস—অন্ন গোধূম বিবিধ ফল সকলে ভোজন করিয়াছে—ইহাতে দেহবৈকল্যের কোন কারণই থাকিতে পারে না। তবে কি তাঁহারা অভিশপ্ত! বানপ্রস্থাশ্রয়ী কোন মহাতপা তপস্বীর রোষানলে পতিত? কই—কেহ তো কোন অন্যায় কার্য করিয়াছে বলিয়া স্মরণে আসিতেছে না।

রাজকন্যা সুকন্যার মনে পড়িল গত অপরাহ্নে তিনি একটি বল্মীক-স্তূপের ভিতরে একটি উজ্জ্বল খদ্যোতপ্রভ পদার্থকে কণ্টকবিদ্ধ করেন এবং ঐ স্তূপটি কাঁপিয়া উঠে।

এই কথা শুনিয়া মহারাজ শর্য্যাতি তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীসহ তথায় উপস্থিত হইলেন।

পদশব্দ কোলাহল শুনিয়া ঐ বল্মীকস্তূপ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃত্তিকা স্তূপের ও লতাজাল ছিন্ন করিয়া আবির্ভূত হইলেন একজন তপস্বী—শীর্ণকায়, ক্রুদ্ধ—তাঁহার মুখমণ্ডলের একটি নয়ন কোণে শুষ্ক রক্তধারা দেখা যাইতেছে।

নরপতি তপস্বীকে দেখিয়াই চিনিলেন—ইনি মহাতপা ত্রিকালজ্ঞ ভৃগুতনয় মহর্ষি চ্যবন। বনভূমিতে একাকী বিচরণ করিতে করিতে সম্ভবত সহসা সমাধিস্থ হন…তারপর এই অবস্থা।

সকলে তাঁহার পদতলে পড়িয়া মার্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। ক্রুদ্ধ তপস্বী বলিলেন—সখিগণসহ রাজকুমারীর কলকোলাহলে তাঁহার তপোভঙ্গ হয় এবং নয়ন মেলিয়া তাকান। তাঁহার নয়ন কোণে কণ্টকাঘাতের জন্য দায়ী

রাজকুমারী নিজে! তাঁহারই অভিশাপে সকলের শৌচকার্য বন্ধ হইয়াছে। যদি এই ক্ষণে তপোভঙ্গের জন্য দায়ী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয় তবেই সকলে অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন। নতুবা—

প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত রাজা মহর্ষির দিকে চাহিলেন…অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্থ এই তপস্বীর সমস্ত দেহে ক্ষতচিহ্ন, উলঙ্গপ্রায় দুর্গন্ধযুক্ত দেহ—জটাজালে উৎকুন, বল্মীকপূর্ণ শ্মশ্রুজাল যেন শত বৎসরে ধৌত হয় নাই। নৃপতির বাকরোধ হইল।

রাজার চিন্তাসূত্রে বাধা দিয়া তপস্বী গর্জন করিয়া উঠিলেন: এই মুহূর্তে মনস্থির কর রাজা শর্য্যাতি। হয় কন্যাদান নতুবা সমগ্র সঙ্গীবাহিনীসহ সকলের অবশ্য মৃত্যু…বল, কি তোমার কাম্য?

সহসা শ্রুত হইল রাজকুমারীর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর: 'সানন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম মহর্ষি!'

রাজা শর্য্যাতির কণ্ঠে আর্তনাদ ফুটিয়া উঠিল।

নিষ্কম্প কণ্ঠে সুকন্যা বলিলেন—'পিতা! একজনের বিনিময়ে যদি সহস্রজনের জীবন রক্ষা হয়—সেই কি কাম্য নয়? জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই বিধিনির্বন্ধ। আমি জানিব যে ত্রিভুবনখ্যাত মহর্ষি চ্যবনের ধর্মপত্নী হইবার জন্যই বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

অদৃষ্টবাদী রাজকুমারী বনভূমিতে রম্য তপোবন নির্মান করাইয়াছেন। পিতা তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পদ, দাসদাসী, সব কিছুই দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সুকন্যা কয়েকটি সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করেন নাই। বৃদ্ধ স্বামীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন—তাই! রাজকুমারী অরণিকাষ্ঠ সংগ্রহ করেন—ফলমূল আহরণ করেন! দুগ্ধজাত ক্ষির-নবনী স্বামীকে ভক্ষণ করান।

দিন চলিতেছে। মহর্ষি চ্যবন বিষন্নচিত্তে সেবারতা রাজকুমারীর দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন জ্বালায় তিনি শিহরিয়া উঠেন। ক্রোধবশে একটি চরম অন্যায় কার্য তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন নিরুপায়! উপায় থাকিলে রাজকুমারীকে মুক্তি দান করিতেন। কিন্তু বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য—তাই তিনি নিরুপায়। অসীম তপস্যাবলে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন! পারেন পরকে বরদান করিয়া অনন্ত যৌবন দান করিতে, পারেন অভিশাপ দিয়া একটি নগরীকে ধ্বংস করিতে…সবই পারেন—কেবল পারেন না ঐ তপোবল নিজের উপরে প্রয়োগ করিতে! পারেন না তপোবলে নিজের বার্দ্ধক্য দূর করিয়া নবযৌবন লাভ করিতে!

তাইতে তিনি বিমর্ষ···বিষণ্ণ···অন্তরে তাঁর নিয়ত দীর্ঘশ্বাস ! তিনি লক্ষ্য করেন অপটু রাজকুমারী সংসারকর্ম আয়ত্ব করিয়াছেন ! দুগ্ধ দোহন, ফলমূল আহরণ সবই হাসিমুখে করিতেছেন। কোনদিন তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখেন নাই ! তিনি অন্তর্যামী ! না···তপোবলেও সুকন্যার মনে কোন বিরক্তি বা তিক্ততা তিনি জানেন নাই···তাই তাঁর এই মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস···

সেদিন প্রভাতে সরোবরে অবগাহন করিয়া সিক্ত বসনে সরোবরতীরে উঠিয়াছেন রাজকুমারী সুকন্যা ! সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন দ্যুতিমান দুইজন যুবক। তাঁদের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় বিভা···বর্ণচ্ছটা ! রাজকুমারী বুঝিলেন—ইঁহারা সাধারণ মানব নহেন···

সিক্তবসনে যৌবনের প্রতিটি অঙ্গরেখা প্রতিভাত। সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই যে লজ্জিত দেহকে আবরিত করেন। সিক্ত বসনে কলসপূর্ণ পানীয় জল লওয়া তাঁহার নিত্যকর্ম।

দেবোপম যুবকদ্বয়ের একজন সুকন্যার পথরোধ করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন—'কে তুমি লাবণ্যময়ী—এই নির্জন সরোবরে একাকিনী ! কোথায় নিবাস···কি তোমার নাম ?'

'আমি সুকন্যা— মহর্ষি চ্যবনের ধর্মপত্নী।'

'ধর্মপত্নী !'—উচ্চহাস্যে মুখরিত হন যুবযুগল ঃ—'জানি—বুঝেছি তোমার পরিচয়। সুকল্যাণি !—অভিশাপগ্রস্থ তুমি নিরুপায় হয়ে অতি বৃদ্ধ তপস্বীকে বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলে···সে কথা আমাদের অজানা নাই।

নিম্নস্বরে রাজবালা উত্তর দেন—'সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমার পথরোধ করবেন না। কে আপনারা ?'

মৃদু হাসিয়া যুবকেরা বলিলেন—'আমরা সূর্যতনয় অশ্বিনী কুমার-যুগল—আমাদের চিনেছো বোধ হয় ?'

প্রণাম করিয়া সুকন্যা বলিলেন—'বলুন দেবগণ, কেন আপনাদের নির্জন সরোবরতীরে আগমন।'

অশ্বিনী কুমারগণ উত্তর দেন ঃ 'সুকুমারী তুমি দেবদুর্লভা, তোমার এই রূপের খ্যাতি বিশ্ববিদিত। বৃদ্ধ স্বামীর গৃহে তুমি একান্ত বেমানান। বৃদ্ধ তপস্বীকে ছাড়িয়া আমাদের ভজনা কর।'

ঈষৎ হাসিয়া রাজকুমারী উত্তর দেন ঃ 'দেবগণ ! মহর্ষি সর্বজ্ঞ এবং অন্তর্যামী। তিনি জানিবেনই, তখন তাঁহার ক্রুদ্ধ অভিশাপ হইতে—'

কথা কাড়িয়া লইয়া দেবগণ বলিলেন—'শুভে ! তোমার স্বামীর

সম্মতি লইয়া আমাদের ভজনা কর, পরিবর্তে তোমার স্বামীকে দিব অনন্ত যৌবন এবং দেবোপম রূপ ও কান্তি। আমরা স্বর্গ-বৈদ্য, এ কথা বোধ হয় তোমার অজানা নয় !'

'কিন্তু !'—সুকন্যা কি যেন বলিতে চাহেন।

দেবযুগল বলেন—'মহর্ষি অন্তর্যামী। সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র তিনি বুঝিবেন যে স্বামীর সম্মতিতে দৈহিক মিলনেচ্ছু উচ্চবর্ণ জাত পরপুরুষ ভজনা করা মনুর বিধানসম্মত !'

মহর্ষি সানন্দে সুকন্যাকে সম্মতি দিলেন। দেববরে যৌবন পুনঃ প্রাপ্তিতে জরাগ্রস্ত অশক্ত দেহে শক্তির সঞ্চার হইলে শক্তি সঞ্চারিত নব দেহে অপূর্ব রূপযৌবনবতী তরুণী ভার্যা লইয়া জীবনের মধুরস আস্বাদন করিতে তিনি উৎসুক হইলেন !

লজ্জাবনত মুখে সুকন্যা দেবগণের নিকটে ফিরিলেন এবং বলিলেন—'মহর্ষি নিঃসর্ত সম্মতি দিয়াছেন ! কিন্তু আমার হৃদয় দ্বিধাগ্রস্থ। আমিও একটি সর্ত আরোপ করিতে চাই।

'কি সর্ত ?'—আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করেন দেবযুগল !

'স্বামীসহ আপনারা ঐক্যরূপ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়ান। যাঁহার গলায় বরমাল্য দান করিব—'

কৌতুকমিশ্রিত স্বরে দেবগণ বলিলেন—'তথাস্তু ! মহর্ষিকে আহ্বান কর ! আমরা তিনজনে এই সরোবরে অবগাহন করিয়া তিন জনের সমরূপ হইব ! আমাদের কোনরূপ প্রভেদ থাকিবে না। যাঁহাকে মাল্য দান করিবে তাঁহাকেই তুমি ভজনা করিবে।'

স্বচ্ছ সরোবর হইতে দেবমায়ায় উত্থিত হইলেন তিনজন অপূর্ব রূপবান যুবাপুরুষ···

শুভ্র চিনাংশুক বেশধারী—মণিমাণিক্য খচিত কিরীটি শোভিত দ্যুতিমান ! অধরে স্ফুরিত হাস্য···নয়নে ললিত দৃষ্টি। কে—কে এই দেবোপম যুবক ! ইনিই কি মহর্ষি চ্যবন ?

পীতবসন···শুভ্র পুষ্পশোভিত কুসুমমুকুটধারী অপূর্ব ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান··· ! নয়নে কৌতুক ভাতি, আননে ভ্রূভঙ্গী···! কে—কে এই কান্তিমান দেবকুমার ! ইনিই কি মহর্ষি চ্যবন ?

রক্তবসন···হীরক মণিমাণিক্য রত্নহারশোভিত ইন্দ্রতুল্য কিরীটিধারী··· কন্দর্পসম কান্তিমান যুবক। নয়ন ভয়ার্ত—ম্লান দৃষ্টি ! কে—কে এই অমর্তবাসী ! ইনিই কি নবরূপে মহর্ষি চ্যবন ?

তিন জন সমরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান! বরমাল্য হস্তে বিবশ দেহ অধীরা বিহ্বলা রাজকুমারী…জরাগ্রস্ত ঋষিজায়া সুকন্যা…

যদি ভ্রান্তি হয়!

না,—স্বামীর সম্মতিতে দৈহিক মিলনেচ্ছু উচ্চবর্ণের পরপুরুষ ভজনা করা মনুর বিধানসম্মত। তাহাতে সতীধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু! এই 'কিন্তু'ই ভারতের চিরন্তন নারীধর্ম! পরপুরুষ ভজনা যে কারণেই হোক পরিত্যাজ্য। নারীধর্মের সহিত দেশাচারের চিরবিরোধ।

কম্পিত নয়নে সুকন্যা তাকান তিন জনের নয়নের দিকে! এক রূপ, এক বিভা, এক দেবজ্যোতি—তবু একজনের নয়নে স্মিত হাসি! শুভ্র চিনাংশুক বেশধারী দ্যুতিমান সেই যুবক! স্মিত হাসি এ তো দেবগণের লীলা—ছলনা। অসহায়া আবিষ্টা নারীকে লইয়া তাহাদের কৌতুকলীলা চিরন্তন, না-না-ইনি পতি হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় পীতবসন শুভ্র পুষ্পশোভিত কুসুমমুকুটধারী, নয়নে কৌতুক ভাতি!

এই সুকঠিন পরীক্ষায় সে পরীক্ষার্থিনী, তাই পরীক্ষকের সকৌতুক চাহনি! না—না—ইনি হইতে পারেন না! কঠিন পরীক্ষার সামনে মর্তবাসীর পক্ষে এ সম্ভব নয়, ইনি নিশ্চয় মহর্ষি নন!

তৃতীয়ের দিকে চাহেন রাজকুমারী সুকন্যা। রক্তবসনধারী মণিমাণিক্যখচিত রত্নহার কণ্ঠেতে এই রূপবান নবীন যুবক! কে ইনি! ইনিই কি মহর্ষি চ্যবন?

নয়নে তাঁর আবেগবিহ্বল চাহনি! উদ্বেগ আকুলিত মুখমণ্ডলে কি যেন জিজ্ঞাসা! সমগ্র দেহ থর থর কম্পমান…

স্থির নিশ্চয় হন ঋষিজায়া সুকন্যা। ইনি নিশ্চয় মানবসন্তান। ধরিত্রীর বুকেই এঁর জন্ম!

স্থির নিশ্চয় চিত্তে বরমাল্য দান করেন এঁরই কণ্ঠে রাজকুমারী সুকন্যা। আতঙ্কে তাহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসে। যদি ভ্রান্তি হয়! যুগল দেবতার প্রিয়হাস্যে মুখরিত হয় বনাঞ্চল! আবিষ্ট কর্ণে শোনেন দেবগণের কণ্ঠস্বর…

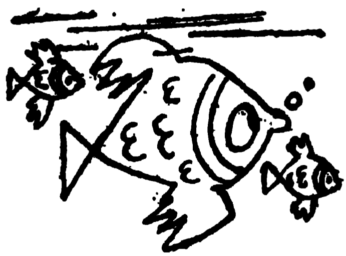
'ধন্য! ধন্য রাজকুমারী সুকন্যা। কায়মনোবাক্যে সতীধর্মে অটুট তুমি, তাই ব্যর্থ এই দেবমায়া! অভেদ তোমার কাছে প্রভেদরূপে প্রতিভাত! আমরা মুগ্ধ—প্রসন্ন। মহর্ষিকে দিলাম এই দেবভোগ্য রসায়ন। ইহার প্রসাদে তোমার স্বামী ফিরিয়া পাইবে যৌবন। দূর হইবে জরা-আধি ব্যাধি। মহর্ষির নামে এই স্বর্গীয় মহৌষধের

নাম চ্যবনপ্রাশ হইয়া ধরাতলে চিরকাল তোমার নারীধর্মের মহিমা কীর্তন করিবে।

আবেগাকুল সুকন্যা ভূলুণ্ঠিতা হইয়া দেবগণকে প্রণাম করিলেন…

কর্ণে প্রবেশ করিল দেবগণের আশীর্বাণী—'আমাদের বরে অচিরে তোমাদের পুত্রসন্তান জন্মিবে। বল্মীক-স্তূপ তোমাদের মিলনের উৎস। সেই পুত্র বাল্মীকি নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত কবি হইবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য আকাশে উদীয়মান থাকিবে ততকাল মহাকবি হিসাবে সুকন্যা তনয়ের যশোগান পৃথিবীতে সশ্রদ্ধসুরে গীত হইবে। আশীর্বাদ করি সুখী হও।

দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।



মাধবী ও গালব

রাজপুরীর অলিন্দে অস্তগামী সূর্যের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে মহারাজ যযাতি-তনয়া রাজকুমারী মাধবী। তাহার আয়ত দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

অন্তরে ক্ষোভ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর পিতৃভক্তির আদর্শ সব একাকার হইয়া পরিণত হইয়াছে দীর্ঘশ্বাসে। কুমারীত্ব, নারীত্ব, জীবনের স্বপ্ন সাধনা—সবই বিপর্যস্ত। পিতৃ-আবেদন রক্ষার্থে আজ সে পণ্যরূপে বিক্রীতা।

পূর্বাহ্নে রাজসভায় কাতরস্বরে পিতা আবেদন করিয়াছেন ঃ 'আমার সত্য রক্ষা কর। আমার সশরীরে স্বর্গযাত্রার পথ রুদ্ধ কোরোনা। আমার এই স্থবির জরাগ্রস্থ দেহের মুক্তির শেষ বাধা দূর কর মাধবী।'

পিতার সেই কাতর আবেদন মাধবী উপেক্ষা করিতে পারে নাই। পিতার স্বর্গযাত্রার পথের বাধা মুক্ত করিতে হইবে বলিয়া নিজেকে পণ্যরূপে বিক্রয়ের সম্মতি দিয়াছে। আগামী প্রভাতে রাজ-ঐশ্বর্য এবং ভবিষ্যতের সুখশান্তি ত্যাগ করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে জনৈক ঋষি-যুবক গালবের সঙ্গে। নিজের দেহমূল্যে ঐ ঋষি-যুবকের দেয় গুরুদক্ষিণার কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। নিজের জীবনকে বিড়ম্বিত অভিশপ্ত করিয়া ঐ যুবককে প্রতিশ্রুত ঋণের ভার হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

অথচ সে চন্দ্রবংশীয় নহুষপুত্র মহারাজ যযাতির পরম আদরের কন্যা। রাজপুরীর পরম বিলাসে এবং পরম সম্মানে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার নবযৌবন। অথচ পতিগৃহ, সন্তান, সংসার ইত্যাদি কত না অন্তরের রঙীন কল্পনা হঠাৎ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে মাধবীর। বিধাতার এ কি অভিশাপ—অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

অভিমানে ক্ষোভে দুঃখে মাধবীর অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বাহির হয় মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস।

মাধবীর পিতা যযাতি জরাগ্রস্থ হন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অভিশাপে।

দৈত্যরাজ বৃষপর্বা স্বীয় গুরু শুক্রাচার্যের রোষ হইতে দৈত্যকুলকে রক্ষা করিবার জন্য গুরুর কন্যা দেবযানীর দাসীরূপে নিজকন্যা রাজকুমারী শর্মিষ্ঠাকে দান করেন। মহারাজ যযাতির সহিত বিবাহ হয় দেবযানীর। কিন্তু মহারাজ দেবযানীর দাসী অপরূপ রূপ ও যৌবনের অধিকারিণী শর্মিষ্ঠার প্রতিও আকৃষ্ট হন। ফলে শুক্রাচার্যের দারুণ অভিশাপের কবলে পড়েন মহারাজ যযাতি। হন জরাগ্রস্থ। ঐ জরা অবশেষে তিনি শুক্রাচার্যের কৃপায় শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত নিজপুত্র পুরুকে দান করিয়া পরিবর্তে পুত্রের যৌবন গ্রহণ করেন। তারপর যৌবনভোগ অথবা সুখতৃষ্ণার নিবৃত্তি না হওয়ায় পুনরায় একদিন জরা ফিরাইয়া লন। বর্তমানে জরাগ্রস্থ দেহে কোন ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করা সম্ভব নয়। অথচ অন্তরে রহিয়াছে অতৃপ্ত পিপাসা।

কিন্তু, সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইলে করিতে হয় মহাদানব্রত বিশ্বজিত যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায়। এইবার যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিলেই স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবে। স্বর্গে পদার্পণ করিবামাত্র অন্তর্হিত হইবে জরা, আসিবে অনন্ত যৌবন, জীবনের অচ্ছেদ আনন্দ, ভোগলিপ্সার অশেষ আশ্বাস—পূর্ণ হইবে স্বপ্ন ও সাধনা।

আজ সেই পূর্ণাহুতির দিন। নিজ পুত্র পুরুকে রাজত্ব অর্পণ করিয়া নিজস্ব যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য ধনরত্ন ইত্যাদি সর্বস্ব দান করিয়াছেন অনাথ আতুর অর্থী প্রার্থী ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলকেই কোন ভেদাভেদ না করিয়া। এমন সময় যজ্ঞস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল এক ঋষি যুবক।

ঋষি যুবকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল আবেদন : 'মহারাজ, আমার প্রার্থনা—অষ্টশত শ্যামৈক কর্ণ বিশিষ্ট দুগ্ধধবল অশ্ব ক্রয়ের জন্য বিপুল অর্থ চাই।

এ প্রার্থনা যদি অপূর্ণ থাকে ?

অপূর্ণের অর্থ বিশ্বজিত যজ্ঞের শুভফল ক্ষয়। এ যজ্ঞের কঠোর নিয়ম—যে কোন প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে যতক্ষণ সম্পদের অবশিষ্ট থাকে।

মহারাজ যযাতি বলিলেন, আমার শেষ সম্পদ বিতরিত হইয়াছে। দান করিবার মত কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।

—আছে মহারাজ, অধীর কণ্ঠে উত্তর দেয় ঋষি যুবক গালব। —আছে আপনার অলোকসামান্যা সুন্দরী কুমারী কন্যা মাধবী। তাহাকে দান করুন। তাহার দেহশুল্কে সংগ্রহ করবো শ্যামৈককর্ণ

শ্বেত অশ্বের মূল্য। এ আমার গুরু বিশ্বামিত্রকে দেয় গুরুদক্ষিণার প্রতিশ্রুতি। অতএব এই দানের অস্বীকারে আপনার যজ্ঞফল ব্যর্থ হবে।

স্তম্ভিত হইলেন মহারাজ যযাতি। যজ্ঞস্থলে সমবেত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সুধী ও দর্শকমণ্ডলীও হইলেন স্তম্ভিত।

চতুর্দিক হইতে উঠিল সমবেত ধিক্কার : হীনতম এ দান—ইহার প্রত্যাখ্যানে যজ্ঞফল লুপ্ত হইতে পারে না।

গালব তথাপি অটল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, মহারাজ মনস্থির করুন।

কোন সন্দেহ রাখিতে প্রস্তুত নন মহারাজ যযাতি। অদ্ভুত বিসদৃশ এ প্রার্থনা। তবু তিনি নিরুপায়। স্বর্গযাত্রায় কোন বিঘ্ন ঘটিতে তিনি দিবেন না!

তাহারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাই আজ রাজকুমারী মাধবীর কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

পিতা যযাতির আদেশ : এই ঋষি যুবকের হস্তে মাত্র চারি বৎসরের জন্য তোমায় সমর্পণ করছি। এই স্বল্পকালে তোমার যৌবন মূল্যে সংগ্রহ করতে হবে অষ্টশত শুভ্র শ্যামৈককর্ণ অশ্ব। ততদিন যজ্ঞাগ্নি রক্ষিত থাকবে এবং ততদিন আমার স্বর্গযাত্রার পথও থাকবে রুদ্ধ। আশীর্ব্বাদ করি সার্থক হোক তোমার যাত্রা। সম্ভব হোক আমার স্বর্গযাত্রা এবং জরামুক্তির প্রয়াস।

এই অদ্ভুত তুষারশুভ্র একটি কর্ণ—তথা শ্যামৈককর্ণ বিশিষ্ট অশ্ব কোথায় কোথায় আছে সে সংবাদ গালবকে দান করিয়াছেন বৈনতেয় গরুড়। দুইশত অশ্ব আছে অযোধ্যাপতি মহারাজ হর্যাশ্বের অশ্বশালায়।

মহারাজ হর্যাশ্ব ব্রীড়াবনতা অলোকসামান্যা সুন্দরী মাধবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন।

গালব কহিল, মহারাজ, দুইশত শ্যামৈককর্ণ শ্বেতবর্ণ অশ্ব আছে আপনার অশ্বশালায়। উহার বিনিময়ে রাজকুমারী মাধবীর সহিত আপনার হইবে রাক্ষস-বিবাহ। জনৈক ব্রহ্মবাদীর বরদানে প্রতি পুত্র প্রসবান্তে মাধবী পুনরায় কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এক বৎসরান্তে পরম সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসবান্তে আপনা হইতে বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া কুমারীত্ব লাভ করিবে মাধবী—তখন তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

সদ্যজাত শিশুপুত্র বসুমনাকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে মাধবী অতঃপর দুইশত অশ্বের বিনিময়ে কাশীরাজ দিবোদাসের অঙ্কশায়িনী হইল। এখানেও রাক্ষস-বিবাহ বিচ্ছেদ হইল বৎসরান্তে

শিশুপুত্র প্রতর্দনের জন্মের পর। সেই স্থান হইতে মাধবীকে যাইতে হইল ভোজরাজের নিকট। ভোজরাজ উশীনরের নর্মগৃহে ঐরূপে জন্ম হইল পরম সুলক্ষণযুক্ত পুত্র শিবির। এইরূপে সংগৃহীত হইল মাধবীর দেহমূল্যে ছয়শত শ্যামৈককর্ণ তুষারশুভ্র অশ্ব। তারপর ?

না, এই আশ্চর্য অশ্ব পৃথিবীতে আর নাই। বিনতানন্দন গরুড় জানাইয়াছেন বিধাতা সৃষ্ট সহস্র অশ্বের ভিতর চারিশত অশ্বের সলিলসমাধি হইয়াছে। সুতরাং স্বার্থসর্বস্ব হীনমন্য দাম্ভিক ঋষি যুবকের এখন উপায় ?

দাম্ভিক! দাম্ভিকতো বটেই। প্রিয় শিষ্য গালবের নিকট গুরু বিশ্বামিত্র শিক্ষান্তে কোন দক্ষিণা চাহেন নাই। দরিদ্র ঋষি তনয়ের সে সামর্থ নাই তাহা গুরু জানিতেন। তাই তিনি প্রিয় শিষ্যকে প্রিয়বাক্যে গুরুঋণ হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গালবের পুনঃ পুনঃ দক্ষিণাদানের কাঞ্চনমূল্য জানিবার আগ্রহে শেষপর্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্র শ্যামৈককর্ণ বিশিষ্ট অষ্টশত শুভ্র অশ্ব দিতে আদেশ করেন। দাম্ভিক গালব তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

কিন্তু অবশিষ্ট দুইশত অশ্ব সংগ্রহের আর তো কোন উপায় নাই। নিরুপায় গালব চাহিল মাধবীর দিকে।

শান্তকণ্ঠে মাধবী বলিল দেহশুল্কের জন্য এখন আমি বিক্রীত। আমাকে লইয়া এবার চলুন গুরু বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে। যৌবন-শুল্ক ও পুত্রদানে ঐ ঋণ হয়তো পরিশোধ করা সম্ভব হইবে।

লুব্ধ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিমোহিত হইলেন ভুবনমোহিণী রাজকুমারীকে দেখিয়া। তৎক্ষণাৎ মাধবীকে গ্রহণ করিয়া গালবকে ঋণমুক্ত করিলেন।

বৎসরান্তে পুত্র অষ্টকের জন্মদান করিয়া মাধবী পুনরায় কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এরপর কর্তব্য শেষ! মাধবী চাহিল ঋষি যুবক গালবের দিকে। নবীন যুবকের সান্নিধ্যে থাকিবার ফলে নিজের অন্তরে কিসের আকুলতা জাগিয়াছে মাধবী তাহা জানে। ঋষি যুবকের নয়নে কিসের আবেদন নীরব ভাষায় ব্যক্ত তাহাও তাহার অজানা নয়।

সংকোচ ত্যাগ করিয়া একদিন যযাতি দুহিতা বলিল, বন্ধু, এখন আমাদের কর্তব্য কি ? আমি ভারমুক্ত, আপনিও ঋণমুক্ত। আসুন আমরা আবদ্ধ হই চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে—গান্ধর্ব, আর্ষ, রাক্ষস, প্রাজপত্য, বীর্যশুল্কা, স্বয়ংবরা ইত্যাদির কোন্ বিবাহে আপনার অভিরুচি ?

আর্তস্বরে উত্তর দেয় গালব : 'না—না, আমায় ক্ষমা করুন। ঋণমুক্তি শেষে মহারাজ যযাতির নিকটে আপনাকে প্রত্যর্পণ করতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া উঠে মাধবীর। তাহার অন্তর হইতে বাহির হয় অভিমানক্ষুব্ধ গভীর দীর্ঘশ্বাস!

মহারাজ যযাতি সংসার ত্যাগ করিয়া মহাবনে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বানপ্রস্থে মাধবীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গৃহপ্রত্যাগত মাধবী তাহাকে ঋণমুক্ত করিয়া ফিরিয়াছে। এখন আশ্রমে আড়ম্বরশূন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করিয়া তাহার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছেন। আজ তিনি রিক্ত—তাহার সর্বস্ব বিতরিত। জরাগ্রস্ত দেহভার মুক্ত করিবার পূর্বে রাজকুমারীর বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। নিজ কন্যাকে পণ্যরূপে দান করিয়া বিবেক-দংশনের মর্মজ্বালায় তাঁহার চারিবর্ষ কাটিয়াছে, তাই এই স্বয়ংবর সভার আয়োজন।

বনভূমির আশ্রমে স্বয়ংবর সভা বসিয়াছে। রাজকুমারীর অসামান্যা রূপের খ্যাতি, তাহার পিতৃভক্তি, পিতৃঋণ পরিশোধ, চারিটি পরম গুণবান পুত্র দান, কন্যাকাবস্থা প্রাপ্তির সংবাদ ভারতের প্রতিটি রাজন্য-বর্গেরই পরিজ্ঞাত। এই স্ত্রী-রত্ন লাভ করিতে আসিয়াছেন বিভিন্ন রাজ্য হইতে রাজ-অধিরাজ গন্ধর্বগণ। আসিয়াছেন কাশীরাজ দিবোদাস, ভোজরাজ উশীনর, অযোধ্যারাজ হর্য্যশ্ব, মহর্ষি বিশ্বামিত্র—, নবাগত আছেন কাঞ্চী, কোশল, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতির রাজ-অধিরাজগণ। গন্ধর্বলোক হইতে আসিয়াছেন চিত্ররথ, বসুসেন প্রভৃতি।

তখন দেখা গেল বরমাল্য হস্তে মাধবীর চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।...সে কোথায়? উন্নতদেহ হেমজ্যোতিস্ফুরিত মুখমণ্ডল, শিরে স্বল্প জটাজাল, চক্ষে আকুল জিজ্ঞাসা, কণ্ঠে নীরব ভাষা—সে কোথায়?

মাধবী দেখিল—ঐ যে, সকলের পশ্চাতে সসঙ্কোচে উপবিষ্ট সে। মহা ঐশ্বর্য্যশালী মহাতেজা রাজন্যবর্গের সমসারিতে বসিবার স্পর্ধা তাহার নাই।

উৎসুক চক্ষে সে চাহিয়া আছে বরমাল্য হস্তে অগ্রসরমান মাধবীর দিকে।

আসিতেছে—বরমাল্য হস্তে রাজকুমারী আসিতেছে গালবের দিকেই।

পরমানন্দে চঞ্চল হয় গালবের হৃদয়। তাহার স্বপ্নকল্পনা বুঝি এতদিনে সার্থক হইবে। এই কল্পনাই এতদিন লুকাইত ছিল তাহার হৃদয়ের অন্তস্থলে।

রাজকুমারী গিয়া দাঁড়াইল গালবের সম্মুখে। এখনই হয়তো দুলিবে শত রাজঅধিরাজ আকাঙ্খিত বরমাল্য গালবের কণ্ঠে।

অলক্ষ্য হইতে সহসা ভাসিয়া আসিল সাবধান বাণী—'তিষ্ঠ!'

এই সাবধান বাণী গালবগুরু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের।

সেই সাবধানবাণীতে আরও শোনা গেল : মাধবী! গালব তোমার পুত্রতুল্য। আমি তোমাকে গ্রহণ করায় আমার প্রিয়শিষ্য গালবের তুমি গুরুমাতা।

সচকিত মাধবীর হস্ত হইতে ভূতলে স্খলিত হইল বরমাল্য।

বজ্রহুঙ্কারে তখনও উচ্চারিত হইতেছিল—তুমি গালবের মাতৃসমা মাধবী।

মাধবীর চক্ষু উদাস হইয়া গেল। দূর গহন বনভূমির দিকে শূন্যলক্ষ্যে চাহিয়া সে ভাবিতেছে—ধীকৃত ব্যর্থ জীবনের আর কিবা প্রয়োজন। বিবাহ? বিবাহ যে কি, মাধবী তাহা জানে—চারিটি পুত্রের জননী সে। বিবাহের আর প্রয়োজন কি? দেহ মন আত্মা যখন কোন অলক্ষ্য নিয়তির নিয়ন্ত্রণের অধীন তখন কি তার সার্থকতা!

ধীর পদে বনভূমির দিকে অগ্রসর হইল মাধবী। অশ্রুহীন ভাষাহীন—কঠিন তাহার আরক্ত মুখমণ্ডল।

কোথা যাও মাধবী? জিজ্ঞাসা করেন পিতা যযাতি—জিজ্ঞাসা করেন সমবেত রাজন্যবর্গ।

উদাসকণ্ঠে মাধবী বলে—উপান্তের বনভূমিতে। সংসার ত্যাগ করিয়া হইব ব্রহ্মচারিণী, আজীবন করিব ঈশ্বর আরাধনা। অর্জিত পুণ্য দান করিব পিতাকে যাহাতে তাঁহার স্বর্গবাস হয় অক্ষয়।

আবেগভরা কণ্ঠে আর্তনাদ করে গালব : মাধবী ফিরে চাও; শোন আমার—

আবেগহীন শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয় মাধবী : বল পুত্র।

———

বৃদ্ধাকন্যা ও শৃঙ্গবাহন

বসন্তের এক সন্ধ্যায় উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া আছে এক বৃদ্ধা তাপসী। নক্ষত্রমণ্ডলস্থিত অনুজ্জ্বল তারকা অরুন্ধতীর প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাহার জীবনের আদর্শ ব্রহ্মার মানসকন্যা ঐ বশিষ্ঠপত্নী মহাসতী অরুন্ধতী। অচলা স্বামীভক্তি, তপস্যা ও সতীত্বের প্রভাবে ঐ নারী সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্ঠাদি নক্ষত্রের পার্শ্বে স্থান পাইয়া জগতের নারীসমাজকে আদর্শের পথ দেখাইতেছে।

বৃদ্ধা তাপসীর উহা নিত্য দর্শনীয়। কিন্তু আজ ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার নিকটে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মতো দেখা দিতেছে। ক্ষুদ্রাকার মেঘখণ্ড অরুন্ধতীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখিয়াছে! উদ্বিগ্না বৃদ্ধা তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লয় ধ্রুবতারার দিকে। সেখানেও একটি ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের আবরণ। ঐ ধ্রুবতারাই এতকাল তাহার জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আজ সেই ধ্রুবতারা কেন অদৃশ্য! বৃদ্ধা তাপসীর হৃদয় বিচলিত হয়।

রজনীপ্রভাতে বৃদ্ধা শতায়ু হইবে। শতবর্ষ পূর্বের এক ঊষালগ্নে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সেই পরম লগ্ন শতবর্ষ পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে কল্য রজনীপ্রভাতে। তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজনই ফুরাইয়াছে। জরাগ্রস্থ স্থবির দেহভার বহন করিবার আর সামর্থ নাই। কোনরূপে চলিয়া বটবৃক্ষতলে তপস্যার বেদীতে গিয়া বসিল তাপসী।

এই বৃদ্ধার জন্মকাহিনীতে বিশেষ এক রহস্যাবৃত উপকথা আছে। বৃদ্ধার পিতা মহর্ষি কুনির্গর্গ অন্তত একটি কন্যাসন্তান চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখরা পত্নীর নিকট কোন মমত্ব বোধের পরিচয় তিনি পান নাই। মহর্ষি-পত্নী পর পর শুধুমাত্র পুত্রসন্তান উপহার দিবার পর হতাশ মহর্ষি কুনির্গর্গ অবশেষে এক ঊষালগ্নে যোগবলে নিজের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া অপরূপা একটি কন্যাসন্তান সৃষ্টি করিলেন। তদবধি সর্বসুলক্ষণাযুক্ত এই মানবকন্যাকে তাহার পিতৃ-হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন তিনি।

কন্যাগতপ্রাণ মহর্ষি তাহার অন্যান্য পুত্রদের সহিত কন্যাকেও স্বীয় আদর্শে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই কন্যার

সর্বশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং তপস্যার আচারবিধি ইত্যাদি শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল। শিক্ষাদানের পর মহর্ষি কুনির্গর্গ কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণের সংকল্প করিলেন! যেহেতু মহর্ষি গালবনন্দন শৃঙ্গবাহন বিদ্যা, রূপ, গুণ ও বংশমর্য্যাদায় তাহার কন্যার সমকক্ষ সেহেতু ঐ ঋষিকুমার শৃঙ্গবাহনকে জামাতারূপে গ্রহণ করিতে বহু পূর্ব হইতেই উৎসুক হইয়াছিলেন।

একদিন মহর্ষি কুনির্গর্গকে প্রণামান্তে শৃঙ্গবাহন নিজ অন্তরের বাসনা নিবেদন করিল ঃ বলিল,—তাত, আমার ব্রহ্মচর্য আশ্রম সমাপ্ত হইয়াছে। এখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে চাই। প্রবেশের প্রাক্-মুহূর্তে আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী। এই বিবাহে আমার পিতা সানন্দে সম্মতি দিবেন।

মহর্ষি কুনির্গর্গ এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন এবং পরদিনই তিনি শৃঙ্গবাহনের পিতা মহর্ষি গালবের নিকট বিবাহপ্রস্তাব পাঠাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। স্বীয় কন্যার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতেই পিতার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কন্যা কহিল,—পিতা, আমার আদর্শ মহাসতী অরুন্ধতী। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠের মত যদি কাহারো সন্ধান পাই তাহা হইলে তাহাকেই বিবাহ করিব, নচেৎ চিরকাল অনূঢ়া থাকিয়া তপশ্চর্চা করিব, কদাপি মাতৃগর্ভজাত রিপুবশ কোনো মানবসন্তানকে বিবাহ করিব না।

বিস্মিত ও ব্যথিত পিতা প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—কন্যা, ঐরূপ পাত্রের সন্ধান করা দুঃসাধ্য। তোমার এই অদ্ভুত সংকল্প পরিত্যাগ কর। ঋষিকুমার শৃঙ্গবাহনই একমাত্র রূপে, গুণে এবং বংশমর্য্যাদায় আমাদের সমতুল্য। অতএব সর্বতোভাবে সে তোমার যোগ্য।

কন্যার পরিণাম চিন্তা করিয়া মহর্ষি অনুরূপ অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু সবই হইল ব্যর্থ। তথাপি মহর্ষি কুনির্গর্গ বিবাহ ব্যাপারে কন্যার সম্মতি পাইলেন না।

না, তাপসী কন্যার ইচ্ছানুরূপ কোনো পুরুষ এই সুদীর্ঘ জীবনে কখনও আসে নাই। ব্যর্থ হইয়া শৃঙ্গবাহন ফিরিয়া গিয়াছে নিজের তপোবনে। তাপসীরও সংকল্পচ্যুতি হয় নাই। অনূঢ়া থাকিয়া তপস্যার দৃপ্ত প্রভাবে অদ্যাবধি সে উদ্ভাসিত। ঋষিকুলে বৃদ্ধাকন্যা নামে প্রখ্যাতা হইয়াছে।

আজ বড় হতাশ হইয়া বেদনার্ত হৃদয়ে বৃদ্ধা কন্যা তাহার অতীত জীবনের কথা ভাবিতেছে। অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি পড়ে অদূরস্থিত

কদম্ব, শেফালিকা, বকুল প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষশোভিত পুষ্পোদ্যানের প্রতি। ওইখানেই ত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল ঋষিকুমার শৃঙ্গবাহনের সহিত। সহসা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে অশীতিবৎসর পূর্বেকার গভীর অনুরাগে ভরা এক মধুর স্মৃতি।...সে তখন উদ্ভিন্নযৌবনা এক অসামান্যা সুন্দরী ষোড়শী। একদিন প্রভাতে নিভৃত পুষ্পোদ্যানে পূজার্চনার জন্য পুষ্পচয়নে ছিল ব্যাপৃতা। এমন সময় তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সৌম্যদর্শন দিব্যকান্তি এক যুবক।

সযত্ন সংগৃহীত নিজ করপুটের একগুচ্ছ পুষ্পরাশির প্রতি ষোড়শী কন্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যুবকটি মৃদুহাস্যে কহিল,—আমি মহর্ষি গালবনন্দন শৃঙ্গবাহন। দূর হইতে দেখিলাম উচ্চ কদম্বশাখা হইতে পুষ্পচয়নে অসমর্থা হইয়া তুমি বিমর্ষা। তাই একগুচ্ছ কদম্বপুষ্প তোমার জন্যই চয়ন করিয়া আনিয়াছি।

তোমার জন্যই! কথাটির অভ্যন্তরে হৃদয়োল্লাসের সুর ঝনিয়া উঠিতেছিল। নবীনা বালা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'তোমার জন্যই', এ কথার অর্থ?

ঋষিকুমার হাসিয়া কহিল,—বিধাতার অপূর্ব সৃষ্ট বর্তুলাকার এই হরিদ্রাভ পুষ্পদল পূজার উপাচার অপেক্ষা সুন্দরীর কৃষ্ণকেশের কবরীতে ভাল মানাইবে। দেবার্চনার জন্য পুষ্পোদ্যানে অন্য পুষ্পের অভাব নাই। এসো—এই পুষ্পের অলঙ্কারে নিজ হস্তে তোমাকে আজ ভূষিত করি। তুমি হয়তো জানো, আমার এই অধিকারে তোমার পিতার সম্মতি আছে।

ঋষিকুমারের এই সানুরাগ আবেদন শুনিয়া নবীনার মনে পুলকানুভূতির দোলা লাগিল কি? কিন্তু তাহা ক্ষণকাল মাত্র। পরক্ষণেই নবীনার মনে পড়িয়া গেল তাহার পূর্ব-ঘোষিত ইচ্ছার কথা। তিক্তস্বরে অমনি ঋষিকুমারী বলিয়া উঠিল ঃ না, পিতার কাছে আমার অসম্মতি জানিয়েছি। রিপুবশ নারীগর্ভজাত কাহাকেও বিবাহ করিতে আমি অনিচ্ছুক। যদি কোন মহর্ষির মানসপুত্রের সাক্ষাৎ পাই তবেই আমি বিবাহে সম্মত হইব, নচেৎ সারাজীবন তপস্যা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিব।

স্তব্ধ শৃঙ্গবাহন অতঃপর কহিল,—মনে রেখো কুমারী, কদম্ববৃক্ষ সারা বৎসর কুসুমিত থাকে না। বকুল, শেফালী প্রভৃতি কুসুমগুলি রাতের অন্ধকারে প্রস্ফুটিত হয় বটে, কিন্তু প্রভাতের ঊষালোক সহ্য করিতে পারে না বলিয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়ে। তাই এই কুসুমেরা দেবপূজায় অস্পৃশ্য। কালক্রমে তোমার রূপ-যৌবন কিছুই থাকিবে না। সময়ে মহাকাল যেমন তাহার প্রদত্ত সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সব দিয়া তোমাকে

ভরাইয়াছে তেমনি আবার সেই মহাকালই সবকিছু ফিরাইয়া লইবে। মহাকালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত অফুরন্ত সৌন্দর্যের অকৃপণ দানে গড়ে ওঠা তোমার এই নয়নাভিরাম দেহটি যৌবন অন্তে কোনো প্রেমিককেই আর আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে না। তখন পুষ্পহীন বকুল ও শেফালী বৃক্ষাদির মতই তুমি হইবে হতশ্রী। শীতের আঘাতে পত্রহীন অশ্বত্থবৃক্ষের মত হইবে তোমার সকরুণ অবস্থা। তোমার জীবনে তখন নামিয়া আসিবে গভীর হতাশা ও বিফলতার বিষাদ। তোমার সানন্দ সম্মতির প্রত্যাশায় আমি এই মুহূর্তে উন্মুখ। আমার সে প্রত্যাশায় তুমি কি সাড়া দেবে না সুন্দরী ?

না-না-না, কখনই না।

ইচ্ছা-গর্বিতা নারী এবারেও সোচ্চারে ফিরাইয়া দিল শৃঙ্গবাহনের উন্মুখ প্রত্যাশা। অবশেষে ঋষিকুমার হতাশাপীড়িত কণ্ঠে বলিল,—শান্ত হও বালা! আমার প্রতি বিরূপ হইও না। কিন্তু জানিও কুমারী, তোমার ঐ সংকল্পের সিদ্ধি একেবারেই অসম্ভব। ঐরূপ কোন ঋষি-কুমার পৃথিবীতে থাকিলে নিশ্চয়ই তাহা আমাদের জ্ঞাত হইত। এই মুহূর্তে আমি বিদায় লইতেছি। শুধু এই কথা মনে রাখিও, যদি কোনদিন কোনো ক্ষণে আমার প্রয়োজন হয় তবে আমাকে স্মরণ করিও। আমি আমৃত্যু তোমারই জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

ঊষালগ্ন সমাগত। স্মৃতির রোমন্থন করিয়া আর কি হইবে? প্রস্তুত হইল বৃদ্ধাকন্যা। যোগবলে দেহত্যাগ করিবার জন্য তাহার প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে চালিত করিবে, এমন সময় তাহার সম্মুখে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন দেবর্ষি নারদ।

নারদ কহিলেন—ক্ষান্ত হও বৃদ্ধা কন্যা। আজীবন স্ব-ইচ্ছায় অনূঢ়া থাকিয়া বিধাতার চিরন্তন বিধিকে তুমি লঙ্ঘন করিয়াছ। বেদোক্ত চতুর্বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনকে করিয়াছ অস্বীকার। যৌবনের ধর্মকে দলিত করিয়া অকালে ব্রহ্মচর্য ব্রতাবলম্বনে তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলে। সেই পাপে বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক প্রভৃতি কোন লোকেই তোমার প্রবেশাধিকার নাই। ফলে তোমার অতৃপ্ত আত্মা মর্ত্যলোকেই বিচরণ করিবে।

হায়! একি বিধি! দেবর্ষির বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইল বৃদ্ধা তাপসী। বিধাতার এই বিধি তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

আর্তস্বরে বৃদ্ধা বলিল : দেবর্ষি, এখন উপায় ?

দেবর্ষি কহিলেন,—বিধাতার এইরূপ বিধানকে সার্থক করাই মানব-ধর্ম। উহা পালিত হয় নাই বলিয়া তোমার পাপ হইয়াছে। এই বৃদ্ধাবস্থাকালে কেবলমাত্র বিবাহ করিলেই সেই পাপ ক্ষয় হইবে না, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই বিগতযৌবনকে তপস্যার বলে অন্তত একরাত্রির জন্যও আকর্ষণ করিয়া সর্ব উপাচারে ভোগ করিলে তোমার পাপক্ষয় হইবে। কিন্তু নিজের তপস্যাবল নিজের উপর প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তোমার স্বর্গযাত্রার পথ সুগম করিবার জন্য অন্য কেহ যদি তাহার অর্জিত তপঃশক্তি বলে তোমাকে এক রাত্রির জন্য যৌবন দান করিতে ইচ্ছুক হয় তবেই তাহা সম্ভব।

দেবর্ষি নারদ অতঃপর অন্তর্হিত হইলেন।

বিহ্বল বৃদ্ধাকন্যা হতাশ হইয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকে অরুন্ধতী নক্ষত্র। ব্যাথিত চিত্তে ভাবিতে থাকে—'কে দেবে আমাকে স্বর্গপ্রবেশের অধিকার! প্রেমিক ঋষিকুমারকে ফিরাইয়া দিয়াছি। বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করায় দেবসমাজে আমি এখন একটি নিষ্ফলা রসালবৃক্ষের মতই অনাদৃতা। হায়! কে আর করিবে আমার মত বিগত-যৌবনা পক্বকেশা দন্তহীনা বৃদ্ধাকে বিবাহ?'

'আমি করিব—!'

চমকিত হইল বৃদ্ধা কন্যা। সহসা বিনিন্দিত হইল এ কাহার কণ্ঠস্বর! স্নিগ্ধ বাতাসে যেন বাজিল এক অনাস্বাদিত পুলকের চঞ্চলতা। কিশোরী পুষ্পের আকুল গন্ধ-মদিরায় যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিল বৃদ্ধার সর্বাঙ্গ।

কাহার মুখে ধ্বনিত হইল অগ্রসরমান মৃত্যুকে রুদ্ধ করিবার মত ঐ মহাসঞ্জীবনী স্বর-ঝঙ্কার?

চকিতে বৃদ্ধা কন্যা ফিরিয়া দেখিল আজানুলম্বিত শুভ্র জটাজালে আবৃত এক নুব্জদেহ অতি বৃদ্ধ তপস্বী তখন বলিতেছে: হ্যাঁ আমি। আমিই সেই মহর্ষি গালবপুত্র শৃঙ্গবাহন। দেবর্ষি নারদের নির্দেশে জীবনের শেষ লগ্নে তোমার বরমাল্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমাকে দিবে কি সেই অধিকার?

বিহ্বল বৃদ্ধা শতবর্ষ অতিক্রান্ত বৃদ্ধের পদতলে লুটাইয়া পড়ে। সানুনয়ে বলিতে থাকে: আমায় ক্ষমা কর। যৌবন-গর্বে গর্বিতা হইয়া সেদিন বুঝিতে পারি নাই চিরন্তন সত্যকে। আমার সে ভ্রমের কি সংশোধন হইবে?

'নিশ্চয় হইবে—', বলিতে বলিতে বৃদ্ধাকে দুইটি কম্পিত হস্তে তুলিয়া ধরিয়া নিজ বক্ষোপরে স্থাপন করিয়া বৃদ্ধ বলে: 'শোনো প্রিয়ে, সারা-জীবনের অর্জিত পুণ্যবলে এক রজনীর জন্যই তোমার যৌবন ফিরাইয়া দিব—কামনা করিলে তুমিও—

'হঁ্যা প্রিয়তম, আমারও আজীবনের তপস্যার ফল আছে। তোমার এই বাহুবেষ্টনে এবং বক্ষের নিবীড়তায় এখন বুঝিতেছি পুরুষ কত সুন্দর!

পক্ষীকুলের কুহুতান এবং কলকাকলিতে মুখরিত হইয়া উঠিল চতুর্দিক। নবোদ্যমে বাসরের উৎসবে মাতিয়া উঠিল ঋষিতনয়ারা। তাহাদের আহরিত পুষ্পাদির মাল্যে উভয়ের মালাবদল সাঙ্গ হইবার পর বৃদ্ধ শৃঙ্গবাহন প্রবল হুলুধ্বনির মধ্যে কয়েকটি কদম্বপুষ্প লইয়া বৃদ্ধার পক্ককেশে পরম যত্নে গুঁজিয়া দিল। সাড়া পড়িয়া গেল ঋষিকুলে। আরম্ভ হইল ফুলশয্যার প্রস্তুতি। ঋষিবালাগণ অশোক, পলাশ, কিংশুক ইত্যাদি বসন্তের ফুলে ফুলে সাজাইয়া দিল পুষ্পকক্ষের মাঝে শতায়ু-দম্পতির প্রথম মিলনের ফুলশয্যা।

উভয়ের তপস্যার ফলে ইতিমধ্যে নবীন যুবায় পরিণত হইয়াছে শৃঙ্গবাহন, উদ্ভিন্ন যুবতীর রূপ লাগিয়াছে বৃদ্ধা কন্যার সর্বাঙ্গে। পরস্পরের হাত ধরিয়া উভয়ে প্রবেশ করিল অপরূপ সেই পুষ্পকক্ষে। পরিব্যাপ্ত জ্যোৎস্নালোকে সে সময়ে উদ্ভাসিত হইতেছিল সমাগত রজনী।

প্রিয়সখীরা আড়ি পাতিলে হয়ত শুনিতে পাইত ফুলশয্যায় শায়িতা নবীনাবালা অনুচ্চ লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিতেছে: এই সুখ হোক অশেষ। এই মিলন হোক চিরদিনের। ইহলোকে আমাদের মিলনের এই সুখরজনী যেন আর শেষ না হয়।

রজনী শেষের প্রভাতে ঋষিবালাগণ কৌতুহলভরে শতায়ু-দম্পতির পুষ্পকক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল দুই শতায়ু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরস্পর নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া শায়িত রহিয়াছে, কিন্তু উভয়েই প্রাণহীন। এক রজনীর মিলন সাঙ্গ করিয়া যৌবনলব্ধ আত্মা যোগবলে করিয়াছে তনুত্যাগ। তাহাদের মুখমণ্ডলে তখনও ফুটিয়া রহিয়াছে অপরূপ হাসি। সে হাসি পরিতৃপ্তির—সে হাসি পরিপূর্ণতার।

সুশোভনা ও পরীক্ষিৎ

'কে তুমি বরবর্নিনী, এই বিজন কাননে পুষ্পচয়নে রতা ?'

উচ্চহাস্যে মুখরিতা হয় বনবালা। বিলোল কটাক্ষে উত্তর দেয়—'আমি অনার্য্যা মণ্ডুকবালা—আপনার মধুর বিশেষণের উপযুক্ত নই মহারাজ !'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় মহারাজ পরীক্ষিৎ। যেন কৃষ্ণ প্রস্তরে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার খোদিত একটি নারীমূর্তি। ঘন কুঞ্চিত কেশদাম আজানুলম্বিত। নিবিড় অনাবৃত বক্ষযুগলে পত্রলেখা অঙ্কিত, লোধ্ররেনু সজ্জিত মুখমণ্ডলে—কজ্জলশোভিত মৃগনয়নে বনহরিণীর চঞ্চল চাহনি। উচ্ছ্বলিত তার পদক্ষেপন। কৃষ্ণাঙ্গী হইলেও এই নারী সামান্যা নয়, দেহসুষমায় আভিজাত্যের পূর্ণ বিকাশ।

বিস্মিত পরীক্ষিৎ বিহ্বলচিত্তে বলেন, 'জানিনা, কে তুমি মৃগনয়নে, আমার পুরীতে সুন্দরী রমনীর অভাব নাই শুভে! কিন্তু অনার্য্যার এই মোহময়ী রূপ আমি কোনদিন দর্শন করি নাই। আমার আর্য্যামহিষীগণ লক্ষ্মীস্বরূপা। তাহারা স্নিগ্ধ, উত্তপ্ত নয়। তাহারা নিদঘতাপে সুশীতল পানীয়, কারণবারি নহে। তাহারা শান্তি দান করে হৃদয়ে, কিন্তু পারে না দেহে উত্তপ্ত রক্তস্রোত বহাইতে। তাহারা স্নিগ্ধ চন্দ্রিমা, দ্বিপ্রহরের খর করোজ্জল রবিরশ্মি নয়; তাহারা মরুভূমির সুশীতল উদ্যান, উত্তপ্ত বালুকারাশি নয়। আমি লক্ষ্মী চাহিনা, দেবী চাহিনা—চাহি উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা! তাহারা দেহে বহাইবে উত্তপ্ত রক্তস্রোত, হৃদয়ে জ্বালাইবে কামনার অগ্নিশিখা, এই শিখায় নিজেকে দগ্ধ করিতে চাই; তুমি কি জোগাইবে সেই শিখায় ইন্ধন? কি নামে তোমাকে আহ্বান করিব শোভনে?'

'শোভনে!' কলহাস্যে মুখরিতা হয় বনবালা: 'ঐ নামেই আমায় ডাকবেন মহারাজ!'

তুমি আমার শোভনা! তোমায় সুশোভনা নামেই ডাকবো। আমি তোমায় আহ্বান করছি আমার রাজপ্রাসাদের প্রমোদনিকেতন নর্মগৃহে। অনার্যার তপ্ত আলিঙ্গন হৃদয়কে করুক উত্তপ্ত, রক্তে

বহাইয়া দিক অগ্নিস্রোত। তুমি হবে আমার নর্মসহচরী, আমার আহ্বানে সাড়া দেবে কি ?

মহারাজ সর্ত আছে! একটি সর্তে আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি।

কি সর্ত ? অধীর স্বরে প্রশ্ন করেন মহারাজ পরীক্ষিৎ, 'যে কোন সর্তে আমি প্রস্তুত।'

সুশোভনা স্মিতহাস্যে উত্তর দেয়, সামান্য এ সর্ত ; বারি আমাকে দেখাবেন না। আমি অভিশপ্তা। বারি দেখিবামাত্র আমি অন্তর্হিত হব।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন মহারাজ পরীক্ষিৎ : 'এ অতি সামান্য সর্ত—তাই হবে।' অনার্য্য বনবালার হস্তধারণ করেন সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি মহারাজ পরীক্ষিৎ। উন্মাদনায় বিস্মৃত হন নিজের বংশগৌরব—আভিজাত্যের গর্ব ; অবলুপ্ত হয় বিবেকের নিষেধ।

প্রমোদ শিকারে বাহির হইয়াছিলেন পরীক্ষিৎ। বনহরিণীর পরিবর্তে বনরমণী সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন রাজপুরীর একান্তে নর্মগৃহে। দ্বারে নারী প্রহরিণীর প্রতি কঠোর আদেশ—গৃহে কোনরূপ জল আসিবে না। গোদুগ্ধ এবং কারণবারি করিবে পিপাসা নিবারণ। রাজমন্ত্রীকে অর্পণ করিয়াছেন রাজ্য শাসনের দায়িত্ব। শান্তিভঙ্গের জন্য সাক্ষাৎ আলোচনা সকলই নিষিদ্ধ। আদেশের পর আদেশ—যদি কোন রাজা রাজসূয় যজ্ঞের জন্য বশ্যতা স্বীকার করিতে বলেন তৎক্ষণাৎ রাজকর দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিবে ; অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব রাজ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে বাধা দিবে না। রাজ সিংহাসন শূন্য থাকিবে। প্রজাদের অভিযোগ অনুযোগের বিচার মহামন্ত্রীই করিবেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। চাই অখণ্ড শান্তি যে কোন মূল্যে।

রাজ্যে ঘনাইল কৃষ্ণমেঘছায়া। রাজাশূন্য রাজ্য। নৃপতি—না নির্বাসনে, না বানপ্রস্থে। প্রজাগণ বিক্ষুব্ধ বিষন্ন। পরমভট্টারক সূর্য্যবংশ অবতংশ মহামতি পরীক্ষিৎ একি মায়াজালে আবদ্ধ! সংসারে থাকিয়াই আত্মবিস্মৃত, অনার্য্যামণ্ডুক নারীতে চরম আসক্তি! রাজার মুক্তি কোথায় ? এই মোহজাল হইতে পরম গুণবান নৃপতিকে কে মুক্ত করিবে ?

মন্ত্রীগণ হন চিন্তিত। বিষন্ন রাজমহিষীগণ, প্রজাগণ! মহামন্ত্রী

তাহার সহকর্মীদের লইয়া মন্ত্রণায় বসিলেন। রাজ্য যায় রসাতলে… কুৎসিত আলোচনা নগর ছাড়িয়া সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। রাজ্যের সম্মান, গৌরব ধূলিতলে লুণ্ঠিত। অনার্য্যা নারী রাজার বিবেক পৌরুষকে গ্রাস করিয়াছে। রাজার মোহমুক্তির উপায় কি?

অনুমান হইল এই জলের উপরে কঠোর নিষেধাজ্ঞার ভিতরে কোন রহস্য আছে। তাহারা জানেন জলের উপরে পরম আসক্তির জন্যই এই বনবাসীগণ মণ্ডুক নামে অভিহিত। সামান্য জলাশয় দেখিলেই তাহারা তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং দণ্ডের পর দণ্ডকাল সন্তরণ করে। মণ্ডুকবালার এই বিপরীত রীতির নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য আছে। চিন্তিত মন্ত্রীগণ একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন!

নগরের উপকণ্ঠে নির্মিত হইল পুষ্পকানন শোভিত উদ্যান। উহার কেন্দ্রস্থলে সুরম্য নর্মনিকেতন। উহার এক প্রান্তে সঙ্গোপনে রক্ষিত হইল একটি সুগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়, তাহা ভাসমান পুষ্পশোভিত জলজ উদ্ভিদ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইল।

মহামন্ত্রী মহারাজের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন—রাজপুরীর মধ্যে নর্মগৃহ মহারাজের বিলাসের উপযুক্ত স্থান নয়। তাঁহার জন্য নির্মিত হইয়াছে জলাশয়শূন্য সুরম্য উদ্যানবাটিকা। সেখানে মৃদুমন্দ মলয়ে ভাসিয়া আসিবে অজস্র পুষ্পের সৌরভ, নিদ্রাভঙ্গ হইবে সুকণ্ঠ বিহঙ্গের কলকাকলিতে। রাত্রিতে নীলাকাশে দেখা যাইবে চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ আলোক বিভা।

মহারাজ উৎফুল্ল হইলেন। সত্যই এখানে বিচরণের স্থান নাই। নর্মসখিকে লইয়া জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে অর্থহীন বিশ্রম্ভালাপের স্থান এ রাজপুরী নয়।

পরীক্ষিৎ সুশোভনাকে লইয়া অতঃপর উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিন যায়, কোন পরিবর্তন নাই। মণ্ডুকবালাকে লইয়া বিলাস মগ্ন মহারাজ আত্মবিস্মৃত। তাহার মুক্তির সব আশাই অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে!

সেদিন তিথি অমাবস্যা, কাল সন্ধ্যা। আকাশের উত্তর পশ্চিম কোনে ঘন কৃষ্ণমেঘ সঞ্চিত, আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত। মহারাজ পরীক্ষিৎ নর্মসখিসহ বিচরণ করিতে করিতে নিভৃত সঙ্গোপন জলাশয়ের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা বজ্রগর্জনসহ বিদ্যুৎ চমকিত হইল, প্রচণ্ড ঝড় উত্তাল বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রবল বায়ুর বেগে জলাশয়ের ভাসমান পুষ্প-শোভিত জলজ উদ্ভিদ একদিকে সরিয়া গেল, নির্মল জলের হইল প্রকাশ!

জলাশয় দেখিয়া উল্লসিত মণ্ডুকবালা বলিল—'মহারাজ, আমি বহুদিন অবগাহন স্নান করি নাই। এই নির্মল সলিলে অবগাহনের অনুমতি দিন।'

ক্ষণবিস্মৃত মহারাজ অনুমতি দিবামাত্র সুশোভনা জলাশয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল! ঘন অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল দশদিক। চিৎকার করিয়া পরীক্ষিৎ ডাকিলেন—'সুশোভনে—তুমি কোথায় ?'

আর্তনাদ বনমর্মরে প্রতিধ্বনিত হইল না। ঝড়ের গর্জনে নৃপতির আর্তনাদ ঢাকিয়া গেল। রাজার আর্তচিৎকার আবর্তিত হইতে লাগিল—'তুমি কোথায়—তুমি কোথায় ?'

—না, মণ্ডুকবালা অন্তর্হিতা। মনে পড়িল সুশোভনার কথা—বারি আমাকে দেখাবেন না, বারি দেখিবামাত্র আমি অন্তর্হিতা হইব। আমি অভিশপ্তা।'

মহারাজের ভয়ার্ত চিৎকারে সকলে ছুটিয়া আসিল। জলাশয় তোলপাড় করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। বর্ষণশেষে সমগ্র জলাশয় শূন্য করিয়া মণ্ডুকবালার জলমগ্ন দেহও দৃষ্ট হইল না। সে নাই। সে কি সত্যই অন্তর্হিতা ? অভিশপ্তা ?

না, দৃষ্টিভ্রম নয়। ক্ষণবিদ্যুৎ-আলোকে মহারাজ দেখিয়াছিলেন জলাশয়ের অপর তীরে একজন মণ্ডুক দাঁড়াইয়া আছে। সে কি সুশোভনাকে অপহরণ করিয়াছে। হয়তো সন্তরণ করিয়া জলাশয়ের অপর তীরে যাইবামাত্র মণ্ডুক কর্তৃক ধৃত ও অপহৃত হইয়াছে। অভিশাপ—অন্তর্হিত—, এই সব বনবালার মিথ্যা ছলনা, বিশ্বাসযোগ্য নয়! নিশ্চয় জলাশয়ের অপর তীরে গোপনে মণ্ডুকেরা লুক্কায়িত ছিল। সুযোগ দেখিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন বনচারী মণ্ডুকেরা শত্রুসংহার করিয়া নরমাংস ভক্ষণ করে। অনার্য্যা নারীর সহিত আর্য্যাপুরুষের মিলন মণ্ডুকসমাজে একান্ত নিষিদ্ধ। নিশ্চয় এই নিয়মভঙ্গের অপরাধে সুশোভনা মণ্ডুকদল কর্তৃক অপহৃত ও ভক্ষিত হইয়াছে।

রাজাদেশ প্রচারিত হইল।······বনবাসী সমগ্র মণ্ডুকসমাজকে হত্যা করিতে হইবে। ইহাই তাহাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। দলে দলে রাজসৈন্য অরণ্য তোলপাড় করিয়া মণ্ডুকদের হত্যা করিতে লাগিল। শতে শত মণ্ডুকের ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটাইতে লাগিল, তবু প্রতিহিংসার নিবৃত্তি নাই। মণ্ডুকেরা দেশ অরণ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শোকার্ত মহারাজ ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসায় উন্মত্ত। প্রতিদিন রাজসভায় ক্ষণকালের জন্য আসেন এবং মণ্ডুক অনুসন্ধান করিয়া হত্যার নিত্যনূতন

আদেশ প্রচার করেন, তাহার পর শূন্য নর্মনিকেতনে গিয়া হাহাকার করেন। মন্ত্রী ও মহিষীগণ রাজাকে শান্ত করিতে কোন বিকল্প পথের সন্ধান পাইলেন না। রাজা উন্মত্ত। তাহাকে শান্ত করিবে কে?

একদিন রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইল এক ব্রাহ্মণ। সে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহে আভিজাত্যের পূর্ণ লক্ষণ বিরাজিত। স্বস্তিবাচনের পর ব্রাহ্মণ কহিল, 'মহারাজ, আপনার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ সর্বজনবিদিত। আপনার সুশোভনা মৃতা নহে, সে কুশলে আছে। যদি তাহাকে রাজমহিষীর মর্য্যাদা দান করেন তবেই সে ফিরিবে, নর্মসখিরূপে নয়। সর্ত—এই মুহূর্তে মণ্ডুকনিধন বন্ধের আদেশ প্রচার করুন। সুশোভনাকে আনিয়া দিবার দায়িত্ব আমার······'

সহর্ষে পরীক্ষিৎ মণ্ডুকনিধন বন্ধের আদেশ প্রচার করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিল—'সুশোভনা সাধারণ মণ্ডুকী নয়, সে মণ্ডুক রাজকন্যা। মণ্ডুকসমাজে বিবাহের পূর্বে মণ্ডুকবালারা স্বচারিণী হয়, তাই সে আপনার সেবা করিয়াছিল। এখন তাহার মানসিক পরিবর্তন হইয়াছে, সে সসম্মানে আপনার মহিষী হইবার জন্য উৎগ্রীব! আপনি অরণ্যে অলঙ্কারভূষিত শত সখিসহ শিবিকা প্রেরণ করুন! আমি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপী মণ্ডুকরাজ আয়ু। সুশোভনা আমার কন্যা।'

শত সখি পরিবৃতা বনবালা বিবাহের বধূবেশে। রাজপুরী হইতে প্রেরিত রত্নহার এবং নানা অলঙ্কারের সহিত মনোরম বনজ পুষ্পদলে শোভিত কুঞ্চিত কেশদাম এবং দেহবল্লরী। অধরে মৃদু হাসি! এ হাসি বিজয়চিহ্নের।

এক সখি প্রশ্ন করে—'তোমাকে মহারাজ কিরূপে গ্রহণ করবেন—কি দিবে তাহাকে প্রতিদান?'

উচ্চহাস্যে মুখরিতা হয় অনার্য্যা রাজকুমারী সুশোভনা:—'এই উপহার দিবার জন্যই এই যাত্রার আয়োজন। আমার দেহাভ্যন্তরে আর্য্যরক্ত প্রবাহিত নবশিশুর আবির্ভাব হইয়াছে। সেই হইবে অযোধ্যার ভাবী অধীশ্বর। অপুত্রক মহারাজকে পুত্র দান করিবার জন্যই আমার সেই অভিসার আজ সার্থকতায় পূর্ণ। আর্য্য-অনার্য্যের মিলন গাথা আমি রচনা করিয়াছি, আমার জীবন সার্থক।'

বাহিরে অপেক্ষামান শিবিকাসহ শত রাজপুরবালাগণ অপেক্ষামান। স্মিতহাস্যে শিবিকার দিকে অগ্রসর হয় মণ্ডুক রাজবালা সুশোভনা।

নির্মিত হয় আর্য্য-অনার্য্যের মিলন সেতু।

জরৎকারী ও জরৎকারু

এক উলঙ্গপ্রায় শীর্ণদেহ বৃদ্ধ মুনি উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে করিতে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতেছেন : কে আছ কোথায়, আমার ঘোষণা শোনো—আমার নাম জরৎকারু, পুত্রার্থে আমি একটি কন্যার পানি-প্রার্থী। আমার পিতৃপুরুষগণের জলপিণ্ড দানার্থে তাঁহাদের আদেশ অনুযায়ী একটি পুত্রসন্তান লাভের জন্য আমি বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। মনোনয়নযোগ্যা পাত্রীকে আমার কয়েকটি শর্ত পালন করিতে হইবে। সেই শর্তগুলি হইল—আমি বায়ুভুক, পত্নীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিব না। আমি যাযাবর, পত্নীকে গৃহসুখ দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি দরিদ্র, পত্নীর বেশভূষা এবং বিলাস ব্যসন ইত্যাদি জোগাইতে অক্ষম। আমার মত আমার ভাবী পত্নীকেও সর্বত্যাগী এবং ব্রতচারিণী হইতে হইবে। বিবাহের পর পত্নী আমাকে অবমাননা অথবা আমার অপ্রিয় কোনো কাজ করিলে তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে ত্যাগ করিব। আমার নামের সহিত কন্যার নামের অবশ্যই মিল থাকিতে হইবে। এই সব শর্তাদি পালনে যে কন্যার নিজস্ব সম্মতি আছে তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।

জরৎকারু মুনির মুখে উচ্চারিত ঐ সকল অদ্ভুত শর্তাদি ভূতলবাসী কন্যাদের পিতারা সকলেই শুনিতেছেন এবং মনে মনে ভাবিতেছেন—মুনি কি সত্যই বিকৃতমস্তিষ্ক! ঐরূপ শর্তাধীনে কাহারো পক্ষে কন্যা সম্প্রদান করা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। মুনিকে কেহই কন্যা সম্প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন না।

ভূতলের বহু জনপদ ভ্রমণ করিয়া নিজ শর্তাধীনে কোনো পাত্রী সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে মুনিবর রসাতলে প্রবেশ করিলেন। নাগ বংশের বাসস্থল রসাতলে প্রবেশ করিয়াও জরৎকারু পূর্ববৎ স্বীয় শর্তাবলীর আনুপূর্বিক ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

রসাতলের নাগরাজ বাসুকীর কর্ণে ঘোষণার পূর্ণ বিবরণসহ তাঁহার আগমন-বার্তা পৌঁছিল। চমকিত হইলেন রাজা বাসুকী। পতি প্রাপ্তির আশায় প্রতীক্ষামানা নিজ ভগ্নী জরৎকারীর কথা তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল নাগরাজের। ভাবিলেন এই তো সেই! যাহার

প্রত্যাশায় সত্যযুগ হইতে দ্বাপর—তিন যুগ ব্যাপিয়া উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে তাহার চিরকুমারী ভগ্নী জরৎকারী।

বাসুকির মনে উদিত হইতেছিল সেই সুদূর সত্যযুগের ঘটনাবলী। মনে পড়িতেছিল পিতা মহর্ষি কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর কথা।—

সত্যযুগে বিধাতার নির্দেশিত সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হইয়াছিল উচ্চৈঃশ্রবা নামে একটি দুগ্ধবৎ শুভ্র অশ্ব। উচ্চৈঃশ্রবাকে কেন্দ্র করিয়া মহর্ষি কশ্যপের দুই পত্নী নাগমাতা কদ্রুর সঙ্গে বিহগমাতা বিনতার ইতিমধ্যে তুমুল কলহ শুরু হইয়া গিয়াছিল।

নাগমাতা কদ্রু বলিতেছিলেন—ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

প্রতিবাদ করিয়া বিহগমাতা বিনতা শোনাইতেছিলেন,—কখনই নয়, ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশ শ্বেতবর্ণ।

মাতাগণের কেহই কিন্তু স্বচক্ষে অশ্বটিকে দেখেন নাই, লোকমুখে অশ্বটির কথা শুনিয়াছেন মাত্র। কিবা আসে যায় তাহাতে! এই সামান্য বিষয় লইয়া দুই সপত্নীর বাদানুবাদ ক্রমশ চরমে উঠিল। কলহের পরিণামে উভয়েই প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—যাহার কথা অসত্য প্রমাণিত হইবে তিনি সপুত্রক এবং বংশানুক্রমে অন্যের দাসী হইবেন।

স্বীয় উক্তির যথার্থতা জ্ঞাত হইবার মানসে কদ্রু অতঃপর তাহার পুত্রগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

মাতার নিকট জিজ্ঞাসিত হইয়া পুত্রগণ বলিল—সর্বনাশ! ঐ অশ্বের সর্বাঙ্গ হিমালয়-শিখর সদৃশ শুভ্রবর্ণ, উহার কোনো অঙ্গেই মালিন্যের লেশমাত্র নাই।

পুত্রগণের মুখে অশ্বের পুচ্ছদেশসহ গাত্রবর্ণের সম্পর্কে সত্য অবগত হইয়াও নাগমাতা কদ্রু ভীতা তো হইলেনই না, বরং আদেশ করিলেন: এই মুহূর্তে কৃষ্ণবর্ণের সর্পগণ ঐ অশ্বের নিকটে গিয়া উহার পুচ্ছদেশ আবৃত করিয়া কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত করুক, নতুবা আমাকে সবংশে বিনতার দাসী হইতে হইবে।

ধর্মভীরু বাসুকি, তাহার ভগ্নী এবং অন্যান্য সৎ নাগগণ তাহাদের মাতার এই মিথ্যাচারে সম্মত হইলেন না। এইরূপে বার বার বাধা-প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধান্ধ কদ্রু অভিশাপ দিলেন: রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের অনলে সমগ্র নাগবংশ দগ্ধ হইবে।

অভিশাপে ভীত হইয়া কৃষ্ণসর্পগণ দ্রুতবেগে গিয়া শ্বেত অশ্বের পুচ্ছদেশ আবৃত করিয়া উহাকে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত করিল। তথাপি

এই প্রকার মিথ্যাচরণের জন্য নাগবংশের উপর মাতা কদ্রুর প্রদত্ত অভিশাপের প্রভাব থাকিয়া গেল।

বিনতা ও কদ্রু দূর হইতে কৃষ্ণবর্ণসদৃশ অশ্বের পুচ্ছদেশ নিরীক্ষণ করিবামাত্র বিনতা কদ্রুর দাসীবৃত্তি করিতে অঙ্গীকার করিয়া সংজ্ঞাহারা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

নিজ মাতা ও বিমাতার বাদানুবাদের এই সকল ঘটনা শুনিবার পর নাগকুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শংকিত হইলেন রাজা বাসুকি। মাতার অভিশাপে ভীত হইয়া তিনি সৃষ্টিকর্তার স্মরণাপন্ন হইলেন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বলিলেন—হ্যাঁ, ঐ অভিশাপ ফলিবে কলিযুগের প্রারম্ভে রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে।

এই কথা শ্রবণে শংকিত রাজা নাগকুল রক্ষা করিবার নিমিত্ত সানুনয় আবেদন জানাইলেন ব্রহ্মাকে। অবশেষে সৃষ্টিকর্তার মুখনিসৃত প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় জ্ঞাত হইয়া রাজা বাসুকি স্বীয় ভগ্নীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—নাগবংশ রক্ষার জন্য তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে ভগ্নী। মাতৃদত্ত অভিশাপ হইতে নাগকুলের মুক্ত হইবার অন্য কোনো উপায়ান্তর নাই। পরমপিতা ব্রহ্মার নির্দেশে তোমাকে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

অপেক্ষা! কিসের জন্য অপেক্ষা? বলে নাগবালা!

কম্পিত স্বরে বলেন পরম বৈষ্ণব নাগরাজ বাসুকি,—আমি এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্ত নাগ বিষ্ণু-বরে অমরত্বের অধিকারী। এখন সত্যযুগের শেষ কাল! দেবতারা অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আমাদের হতভাগ্য বংশধরেরা সে অমৃতে বঞ্চিত। তাহাতে ক্ষতি নাই। নাগবংশের প্রায় সকলেই নররূপ হইতে উরগ রূপ ধারণ করিতে পারে। ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর এবং তীক্ষ্ন বিষের অধিকারী তাহারা। অনন্ত নাগ, তুমি, আমি এবং এলাপাত্র—এইরূপ অল্প কয়েকজন মাত্র ব্যতিক্রম। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ধ্বংস হইবার জন্য মাতৃ অভিশাপগ্রস্থ নাগবংশ রক্ষা করিতে পারিবে একমাত্র তোমারই সন্তান।

দৃঢ়স্বরে বলে নাগবালা,—সৃষ্টি রক্ষার জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ওই নির্দেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমার ভ্রাতৃবংশ রক্ষার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কুমারীত্ব রক্ষা করিব আমি, অপেক্ষা করিব যুগ যুগ। কিন্তু আমি তো অমর নই, কবে হইবে সে সর্পযজ্ঞ?

প্রত্যুত্তরে বাসুকি বলিলেন,—সত্যযুগের এখন শেষাংশ। ইহার পর আসিবে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ। দ্বাপরের শেষাংশে রক্তক্ষয়ী ভারতযুদ্ধে স্বয়ং নারায়ণ পার্থসারথী রূপে যোগদান করিবেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর আরম্ভ হইবে কলিযুগ। কলিযুগের প্রারম্ভে মহাবিষধর তক্ষক নাগের দংশনে পান্ডববংশোদ্ভূত অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিতের হইবে প্রাণবিয়োগ। এই অপমৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় সমগ্র নাগকুল ধ্বংসের জন্য সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ বিষধর সর্প মহামন্ত্রের আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া যজ্ঞানলে পতিত হইবে। শেষে তোমার পুত্র সেই যজ্ঞ বন্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট নাগকুল এবং নাগবংশ রক্ষা করিবে।

অস্ফুট স্বরে বলে নাগবালা,—ত্রেতা ও দ্বাপর, এই দুই যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে আমাকে! কিন্তু আমি তো অমর নই, অচিরে জরা ও মৃত্যু হয়ত আমাকে গ্রাস করিবে।

ম্লান মুখে বলেন নাগরাজঃ সে নির্দেশও পরমপিতা দিয়াছেন। যদি তুমি এই কঠোর কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মার ইচ্ছায় জরা ও মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিবে না। যুগ যুগ ধরিয়া তুমি থাকিবে অটুট যৌবনের অধিকারী। সন্তান ধারণের সকল শক্তিই তোমার মধ্যে নিহিত থাকিবে। যখন তোমার পতি আসিবে—

পতি! কে সে মহাত্মন্? জিজ্ঞাসা করে নাগকুমারী।

বড়ই অপ্রিয়, নির্মম এবং নিষ্ঠুর সে কথা। নাইবা জানিলে এখন। চির দুঃখময় তোমার জীবনে স্বামী-সুখ, গৃহ-সুখ কিছুই থাকিবে না। শেষে সন্তান সুখে তোমার জীবন হইবে পরিপূর্ণ আনন্দময়।

ধীরে ধীরে কথাগুলি বলিয়া রাজা বাসুকি অভয় দিলেন: আমি যদি পরম বৈষ্ণব হই, যদি আমার পুণ্যফল কিছু থাকে, তাহা সবই তোমাকে দান করিতেছি ভগ্নী। তপশ্চারণে এবং ব্রহ্মচর্য্যায় আগামী দুই যুগ কাটাও। শুভক্ষণ সমাগত হইলে তোমার সর্বদুঃখের অবসান হইবে।

আবেগমথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠে নাগবালা: তাই হোক ভ্রাতা। মাতৃ অভিশাপ হইতে আমার ভ্রাতৃবংশের নাগকুল রক্ষার ভার আমি গ্রহণ করিলাম। হইব তপশ্চারিণী, করিব কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন, সার্থক করিব পরম পিতার ইচ্ছা। আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমার সঙ্কল্পচ্যুতি না ঘটে।

সজল নয়নে ভগিনীকে আশীর্বাদ করিলেন নাগরাজ বাসুকি।

তদবধি নাগবালার উৎসর্গীকৃত জীবন দিন-মাস-বৎসর হইতে ক্রমশ যুগান্তর অতিক্রম করিয়াছে। কতবার তাহার হৃদয় মাতার উপর অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। পরশ্রীকাতর, ঈর্ষা এবং কলহপরায়ণা মাতা কদ্রুর জন্যই তাহার জীবনে অদ্যাবধি দুর্দশার অন্ত নাই। কতোদিন ভাবিয়াছে সে—অদ্ভুত তাহাদের মাতা। নিজ সন্তানদের মৃত্যু অভিশাপ দিয়াও মাতার চিত্তে এতটুকু বিকলতা আসে নাই! এমনকি উহাদের শাপমুক্ত হইবার কোন নির্দ্দেশও তিনি দেন নাই।

এই দুঃসহ স্মৃতি লইয়াই কত রুক্ষ দিনই না কাটাইতে হইয়াছে তাহাকে। ক্ষণে ক্ষণে তাহার বুকের অভ্যন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে এক অদ্ভুত পিপাসা। প্রত্যেক দেবী, দানবী, নাগ ও মানবী কন্যারা বিবাহ করে—সংসার ধর্মে প্রবেশ করিয়া স্বামীপ্রেমে নিজেকে পূর্ণ করে, কিন্তু সে আজিও অনূঢ়া। সযত্নে রক্ষিত তাহার কুমারীত্ব কাহার পদতলে ডালি দিবে তাহা সে জানেনা! এক্ষণে তাহার নাম হইয়াছে জরৎকারী।

সত্যযুগে বাসুকি-ভগিনী এই জরৎকারী নামক নাগবালার হয়তো অন্য কোনো নাম ছিল। সে নাম সকলেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। নিয়ত বিষন্নতা, তপশ্চারণ, আত্মসংযম তথা ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিয়াছে সে। কী দারুণ সে প্রতীক্ষা! ব্রহ্মার আশীর্বাদে নাগকুলের জীবন রক্ষার্থে একটি পুত্রসন্তান লাভের জন্য বার্ধক্যজনিত ক্ষয়ও শেষপর্যন্ত তার নিকট হার মানিয়াছে। 'জরা' শব্দের অর্থ ক্ষয় এবং 'কারু' শব্দের অর্থ দারুণ। শরীর ক্লিষ্ট করিয়া যুগ যুগ ব্যাপী এইরূপ দারুণ কষ্টসাধ্য জীবন যাপনের জন্য 'জরৎকারী' রূপে তাহার নাম ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে।

গৃহসুখ স্বামীসুখে চিরবঞ্চিতা নাগবালা জরৎকারী শুনিয়াছিল যে তাহার ভাবী স্বামী হইবেন একজন অর্ধোন্মাদ, ক্রোধী, উগ্রতপা মহর্ষি এবং স্বনামা—অর্থাৎ তাঁহার নাম হইবে জরৎকারু।

অতএব পাতাল তথা রসাতলে ঐ মুনিবরের আগমন সংবাদ পোঁছিবামাত্র রাজা বাসুকির মনে হইয়াছে—এই তো সেই, যাহার প্রত্যাশায় তাহার ভগ্নী যুগ যুগ অপেক্ষা করিতেছে। মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহার সর্ব শর্তে সম্মত হইয়া রাজা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই নিজ ভগ্নী জরৎকারীর সহিত

পত্নীপ্রার্থী জরৎকারুর শাস্ত্রসম্মত বিবাহ দিলেন। সকল রসাতলবাসী-গণ সানন্দে নাগকন্যার বিবাহোৎসবে যোগ দিল। রাজা বাসুকি নবদম্পতির বসবাসের জন্য নির্মাণ করিয়া দিলেন স্বরাজ্যের অভ্যন্তরস্থ অরণ্যপ্রান্তে মনোরম এক তপোবন। মিলনের পিপাসায় সকাতরা জরৎকারীর আরম্ভ হইল বহুপ্রতীক্ষিত গার্হস্থ্য জীবন।

বিবাহের পর জরৎকারীর একমাত্র লক্ষ্য হইল অর্ধোন্মাদ মহর্ষির পরিচর্যা ও সন্তোষ বিধান করা। উগ্রস্বভাব মহর্ষির গৃহধর্মের প্রতি দৃষ্টি নাই। এ যাবৎ বন্ধনহীন যাযাবর জীবনযাপন করিয়া তিনি এই দাম্পত্য জীবনে রজ্জুবদ্ধ শার্দুলের মত ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। তাহার প্রেমশূন্য আবেহীন শুষ্ক বৃক্ষশাখাসদৃশ হৃদয়ে যৌবনপ্রমত্তা নাগবালা শত চেষ্টা করিয়াও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা অথবা বিন্দুমাত্র কোমলতার সঞ্চার করিতে পারিল না।

নাগবালার মনে ক্রমশ প্রশ্ন জাগিতেছিল ঃ তাহার এত দিনের সাধনা—তপশ্চারণা—প্রতীক্ষা—বিধাতার নির্দেশ, সবই কি বিফল হইবে! ক্রমে ক্রমে হতাশা বধূরূপী নাগবালার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতেছিল। এমনি অবস্থার মধ্যেই অঘটনটি অকস্মাৎ ঘটিয়া গেল।

সেদিন পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মুনিবর দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তদবস্থায় দ্বিপ্রহর কাটিল। সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। নিশা দেবীর আগমন স্পষ্টতর হইতেছে। তথাপি মহর্ষির নিদ্রা ভাঙ্গিল না।

উৎকণ্ঠিত হইলেন জরৎকারী। স্বামীর এখনও গায়ত্রী মন্ত্রপাঠ এবং সন্ধ্যাবন্দনা ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় নিত্যকর্মগুলি করা হয় নাই। এমতাবস্থায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে মহাপাপ স্পর্শ করিবে, হয়তো তাহার ব্রাহ্মণত্বও নষ্ট হইবে। এখন উপায়! অথচ স্বামীকে জাগাইতে সাহস হইতেছে না। গভীর নিদ্রা ভঙ্গ করিলে যদি উনি রুষ্ট হইয়া অপ্রিয় আচরণের শাস্তিস্বরূপ পূর্ব বিঘোষিত শর্তে পত্নীত্যাগে উদ্যত হন?

ধর্মরক্ষার জন্য অবশেষে নিদ্রামগ্ন স্বামীকে জাগাইতে বাধ্য হইল জরৎকারী। জাগরিত হইবামাত্র ক্রোধে অধীর জরৎকারু বলিলেন,—এ কি অপ্রিয় আচরণ তোমার? বল, কি কারণে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ?

ভীতা জরৎকারীর মুখে নিদ্রাভঙ্গ করিবার কারণ শুনিয়া ক্রোধান্বিত মুনি বলিলেন,—তুমি কি তোমার স্বামীর ক্ষমতাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে কর? সুসুপ্তির সুযোগে ঐ সন্ধ্যা দেবীর পক্ষে আমার ব্রাহ্মণত্বে কলঙ্ক লেপন করিবার সাধ্য নাই।

তাঁহার আহবান মাত্রেই সন্ধ্যাদেবী আবির্ভূতা হইয়া কৃতাঞ্জলীপুটে কহিলেন—ক্রুদ্ধ হইবেন না মুনিবর। আমি নিশা সমাগম হইতে দেই নাই, আপনার নিদ্রাভঙ্গের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমার এমন স্পর্ধা নাই যে মহর্ষির ধর্মাচারে কলঙ্ক লেপন করি।

সন্ধ্যাদেবী মুহূর্ত পরে অন্তর্হিতা হইলেন। তৎক্ষণাৎ গর্জিয়া উঠিলেন জরৎকারু: শর্তভঙ্গের অপরাধে আমি পত্নীত্যাগ করিব বলিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার স্মরণে নাই? আমার তপস্যার প্রভাবকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার জন্য আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেছি। এই মুহূর্তে আমার পথ ছাড়।

'না—।' গমনোদ্যত মুনির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল নাগবালা জরৎকারী। দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—'আমি তোমাকে কিছুতেই অধর্মাচারী অথবা প্রতীজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে মহাপাপী হইতে দিব না।'

কি বলিলে! আমি মহাপাপী—প্রতীজ্ঞা ভঙ্গকারী? আমার অভিশাপে ভস্মস্যাৎ হইবার ভয় নাই তোমার?' মহাতেজা জরৎকারু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

জরৎকারী তথাপি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—'তোমার অভিশাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। বিনা দোষে কাহারো প্রতি অভিশাপ দিলে তাহা নিজেকেই অভিশপ্ত করে। ইহাই বিধির বিধান।

এই উত্তর শুনিয়া অমিততেজা উগ্রতপা যাযাবর মুনি স্তম্ভিত হইলেন। এ যাবৎ দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং নর অথবা নারী—ত্রিভুবনের কেহই তাঁহার সহিত এইপ্রকার দৃঢ় এবং দৃপ্তস্বরে বাদানুবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। এ স্বর যেন কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত অথচ অদ্ভুত পরিসীমায় আবদ্ধ এক সুস্থিত আদেশের।

মুহূর্তমধ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শীর্ণ মুনির করদ্বয় স্বীয় হস্তে বদ্ধ করিয়া নাগবালা পুনরায় বলিল,—তোমার নরকবাসের কল্পনা করাও স্ত্রী হইয়া আমার নিকট হৃদয়বিদারক। আমি কি আমার স্বামীকে প্রতীজ্ঞা ভঙ্গকারী হইয়া, নরকগামী হইতে দিতে পারি?'

যুবতীর করস্পর্শে ক্ষণিকের মধ্যেই মহর্ষির সকল শক্তি হইল অপহৃত। অননুভূত কি এক শিহরণে তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চিত্ত হইল বিহবল। বিহবল স্বরেই মহর্ষি বলিতে লাগিলেন,—'আমি প্রতীজ্ঞা ভঙ্গকারী—নরকগামী, এই সমস্ত কি তুমি বলিতেছ উন্মাদের মত!'

সোহাগমিশ্রিত শাসনের তেজোময় তীব্রস্বরে বলিল জরৎকারী— 'ঠিকই বলিতেছি স্বামিন্, তুমি না তোমার বিগত পিতৃপুরুষগণের কাছে বংশরক্ষার জন্য প্রতীজ্ঞা করিয়াছিলে? এক্ষণে তোমার উদাসীনতায় যদি তাঁহাদের অধোগতি হয় সে অধোগতি তোমার চিত্তকে হয়তো বিকল না করিতে পারে, কিন্তু আমার স্বামীর অধোগতি রুদ্ধ করিবার গুরু দায়িত্ব আমার। নিজ পত্নীর প্রতি নিরুত্তাপ আচরণের জন্য মৃত্যুর পরে পুন্নামক নরকে পতনের অনিবার্য্য পরিণাম তোমার আজীবন অর্জিত তপস্যার ফল কিন্তু রোধ করিতে পারিবে না। জানিও, তদুপরি পিতৃপুরুষগণের নিকট প্রদত্ত প্রতীজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে রৌরব নরক তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে।

মহর্ষি জরৎকারু এতক্ষণ ক্রোধে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাঁহার প্রতীজ্ঞা এবং সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধান। নাগবালার ঐরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সর্বশরীরে ফিরিয়া আসিতেছিল সৌম্য শান্ত ভাব। ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল তাহার শীর্ণ বার্দ্ধক্য, অবলুপ্ত যৌবন ধীরে ধীরে তপোবলে ফিরিতে লাগিল সর্বদেহে, যৌবনের মত্ততা মুহূর্তমধ্যে চঞ্চল করিয়া তুলিল জরৎকারুর হৃদয়।

আবেগের গাঢ়তায় অনুচ্চস্বরে বলিলেন মহর্ষি—'আমি সত্যই মহাপাপী, বিস্মৃত হইয়াছিলাম সংসারধর্ম, আমার বংশরক্ষার প্রতিশ্রুতি। ভুলিয়াছিলাম উচ্ছল যৌবনের নির্দিষ্ট ধর্ম। তুমি প্রকৃতই ধর্মপত্নীর মত মহাপাপ হইতে আমাকে ফিরাইয়াছ। আশীর্বাদ করি পুত্রসুখে তুমি পরম সুখী হও। আমার অর্জিত পুণ্যফলের অর্দ্ধেক এই মুহূর্ত্তে আমাদের ভাবী পুত্রকে দান করিলাম। জন্ম হইতেই সে হইবে সর্বশাস্ত্র বিশারদ, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের সকল জনের মধ্যে এক অতুলনীয় ধীমান। অস্তি! অস্তি!!

বলিতে বলিতে জরৎকারু নিজ পত্নী নাগবালা জরৎকারীকে গভীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

এই সংবাদ অবগত হইয়া তপোবনবাসীগণ উল্লাসভরে স্থির করিলেন—'অস্তি! অস্তি!!' বলিয়া আপন স্ত্রীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য নবজাতকের নামকরণ করা হইবে আস্তিক।

আস্তিকের ধরাতলে জন্মগ্রহণের পটভূমিকা ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছিল। প্রবহমান কালের অভ্যন্তরে ইত্যবসরে নানাবিধ ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল। মর্ত্তে চলিতেছিল নিদারুণ বিপর্য্যয়। কলিযুগ শুরু হইয়া গিয়াছে। কলির প্রারম্ভেই সমাপ্ত হইয়াছে প্রচণ্ড

ভারতবর্ষে। যুদ্ধান্তে পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গারোহণ করিবার পর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পৌত্র পরমধার্মিক মহারাজা পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিধির অলংঘ্য বিধান অনুসারে মানব সন্তান-দিগের মধ্যে নানাবিধ পাপের অনুপ্রবেশ ঘটিতেছিল। পাপ সঞ্চারিত হইতেছিল মুনিঋষিদের মনেও।

অকস্মাৎ একদিন শৃঙ্গী নামে এক ঋষিপুত্র তুচ্ছ কারণে মহারাজকে ব্রহ্মশাপ দিলেন যে সপ্তদিবসের মধ্যেই তক্ষক নাগের দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। আশ্চর্য্য! সপ্তদিবসের মধ্যেই শৃঙ্গীর উক্ত ব্রহ্মশাপ ফলিয়া গেল।

এই মৃত্যুসংবাদে ভয়ানক বিচলিত হইলেন ঋষি কশ্যপ। ব্রহ্মশাপ হইতে মহারাজকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন তিনি। চিন্তা করিতে করিতে মহারাজের পুনর্জীবন লাভের উপায়স্বরূপ একটি সূত্রের সন্ধান পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, বিশেষ কোন শর্ত না থাকায় অভিশপ্ত নাগদংশনে মৃত্যুর পরও বিষহরি মন্ত্র দ্বারা তাঁহার পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা আছে। সেই বিষহরি মন্ত্র প্রয়োগের ইচ্ছায় কশ্যপ ঋষি দ্রুত চলিলেন সদ্যমৃত মহারাজের অন্তঃপুরে। পথিমধ্যে লুক্কায়িত তক্ষক নাগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের মধ্যে শুরু হইল বহুপ্রকার বাক্‌বিতণ্ডা। অবশেষে প্রভূত অর্থদানে বশীভূত করিয়া কশ্যপকে ফিরাইল তক্ষক।

রাজা জনমেজয়ের গোচরীভূত হইল সংবাদটি। নাগ দংশনে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যু এবং অর্থে বশীভূত কশ্যপের বিবরণ শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া রাজা জনমেজয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহনার্থে সমগ্র নাগকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিশাল সর্পযজ্ঞের আয়োজন করিতে মনস্থ করিলেন।

রসাতলে ঐ মৃত্যুসংবাদ পেঁছিবামাত্র রাজা বাসুকি জরৎকারীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—মহাকাল বুঝি সমাগত। দুরন্ত ক্রুর ও বিষধর তক্ষক নাগ হস্তিনাপুরের অধিপতি পরম ধার্মিক মহারাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত করিয়াছে।

পিতার মৃত্যুর জন্য মহারাজের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প শুনিয়া মুনিঋষিগণ ছুটিলেন। তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছায় বলিলেন,—ক্ষান্ত হোন্ মহারাজা, এই যজ্ঞ হইলে ধরা হইতে বিধাতার একটি সৃষ্টি লুপ্ত হইবে।

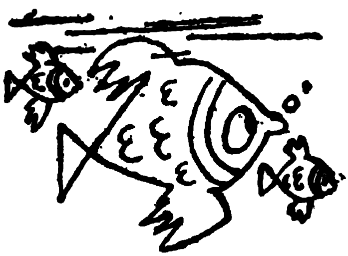
ক্রোধান্ধ মহারাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমার রাজকোষে কি

অর্থের অভাব আছে? এমন কি অর্থ দিয়াছে তক্ষক যে কশ্যপ বিষহরি মন্ত্র প্রয়োগ হইতে নিজেকে নিবৃত্ত করিল? আমি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবই।

সর্পযজ্ঞের আয়োজন অচিরেই শুরু হইয়া গেল। যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল নির্দ্ধারিত দিবসে যথাসময়েই। বহু ঋত্বিক এবং যাজ্ঞিক সেই যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন সর্পকুলকে। সেই আকর্ষণ হইতে কাহারো পলাইবার উপায় নাই। মন্ত্রশক্তির আকর্ষণ বড়ই তীব্র। সহস্র সহস্র সর্পাদি নানা পথে আসিয়া পড়িতে লাগিল যজ্ঞাগ্নিতে।

অত্যন্ত উদ্বেগাকুল চিত্তে নাগরাজা বাসুকি, অনন্ত নাগ ও এলাপাত্র স্মরণ করিতেছিলেন জরৎকারীর পুত্র আস্তিককে।

অবশেষে—হ্যাঁ, অবশেষে দেখা গেল জরৎকারীর ধীমান ও সর্বশাস্ত্রবিদ বালক পুত্র আস্তিক সত্য সত্যই যজ্ঞস্থলীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।



গুণকেশী ও সুমুখ

ইন্দ্র-সারথি মাতলি।

মানবসন্তান তিনি। তাহার অপূর্ব সারথ্যগুণে মোহিত দেবরাজ তাহাকে সখ্যরূপে বরণ করিয়া দেবসভায় স্থান দিয়াছেন। সস্ত্রীক অমরত্ব দানে তাহাকে ধন্য করিয়াছেন। সূত জাতি বলিয়া ধরাতলের সমাজে তিনি অপাংক্তেও এবং দেবসভাতে সেই জন্মসঙ্কোচ ঢাকিবার জন্য নিজের স্থান লইয়াছেন সর্বপশ্চাতের আসনে।

দেবদানবের নানা মহাসমরে অপূর্ব কৌশলে তিনি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছেন। প্রয়োজনে বাসবাদেশে মর্ত্যমানবের রথে সারথি হইয়া যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি জানেন—দেবরাজ তাহার প্রতি শুধু প্রসন্নই নন, কৃতজ্ঞও।

মাতলি চিন্তিত। এই চিন্তা তাহার নিজের জন্য নয়, প্রাণসমা কন্যা গুণকেশীর জন্য। প্রস্ফুটিত পারিজাতের মত কন্যার জন্ম হয়েছে স্বর্গপুরে। স্বর্গের সর্বসুষমামণ্ডিত লাবণ্যময়ী কন্যালাভে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন মাতলি। কৈশোরেই কন্যাকে অপ্সরী রম্ভার নিকটে নৃত্যকলা, গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের নিকটে যন্ত্রসঙ্গীত, অপরূপা সুধাকণ্ঠী কিন্নরীদের কাছে কণ্ঠসঙ্গীত ও দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বিদ্যার প্রথম পাঠে শিক্ষিতা করিয়াছেন। ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার মত কুঞ্চিত কেশদামের জন্য আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছেন গুণকেশী।

ক্রমে গুণকেশী যৌবনে পদার্পণ করিল। এখন সে বিবাহযোগ্যা, তাই মাতলি চিন্তিত।

সর্বকলা পারদর্শিনী অলোকসামান্যা সুন্দরী কন্যার পানিগ্রহণে সমগ্র দেবসমাজ আগ্রহী। অনেকেই মাতলির নিকট এই কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন, কিন্তু মাতলী সম্মত নহেন। প্রত্যেক দেবতাই বিবাহিত। সপত্নে বিবাহ দিতে তিনি চাহেন না। রুদ্র অগ্নিশক্তি সম্ভূত কার্তিকেয়কে জামাতা রূপে পাইতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মার মানসকন্যা দেবসেনার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং—

মাতলি দেবর্ষি নারদের শরণাপন্ন হইলেন। নারদ তাহাকে সঙ্গে লইয়া মাতৃভূমি ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ছদ্মবেশে উভয়ে নগরে,

জনপদে, সর্বস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও মনোমত পাত্রের সন্ধান পাইলেন না। সর্বসুলক্ষণযুক্ত জিতেন্দ্রিয় অমিতবীর্য অবিবাহিত যুবকের সন্ধানে ব্যর্থ হইয়া যক্ষলোক, গন্ধর্বলোক, কিন্নরলোক পরিভ্রমণ করিয়া শেষে পাতালে প্রবেশ করিলেন।

রসাতলে বরুণালোক অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভোগবতীপুরে নাগলোকে প্রবেশ করিলেন। নাগরাজ বাসুকি তখন সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মাতলির আগমনে উৎফুল্ল হইয়া সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন। মন্ত্রীগণ নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। কুশল বিনিময়ের পরে বাসুকি সবিনয়ে তাহাদিগকে এই অসময়ে অনাহূত অবস্থায় এ রাজ্যে পদার্পণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দেবর্ষি আসিবার কারণ বিবৃত করিয়া মাতলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাতলির দৃষ্টি যেন কাহারও উপরে নিবদ্ধ। তাহার মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির স্মিত হাস্য। দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন নাগরাজ বাসুকির পদতলে এক অপূর্ব সৌম্যকান্তি যুবক বসিয়া আছে। যুবকের মুখমণ্ডল ম্লান বিষণ্ণ, দেহমন যেন দুশ্চিন্তায় অবসন্ন—ক্লান্ত।

বিস্মিত নারদ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসুকি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এই হতভাগ্য যুবকের নাম সুমুখ। আমার ভ্রাতা আর্যকের পৌত্র। আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই অমাবস্যা। ঐ দিন নাগশত্রু গরুড়ের সে ভক্ষ্য হইবে। এতক্ষণ উহারই ভবিষ্যৎ লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছিলাম। কিন্তু কোথাও আশার আলোক দেখিতেছি না। সুমুখের পিতা চিকুরনাগকেও গরুড় ভক্ষণ করিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই।

মাতলি হতাশ হইলেন। এত চেষ্টা—এত অনুসন্ধানের পর যদি একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইলেন, কিন্তু তাহার আয়ু? অতএব অসম্ভব এ কল্পনা। মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি গোলকপতির প্রিয়পাত্র—পরম বৈষ্ণব গরুড় বিষ্ণুর বাহন···

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাসুকি বলিলেন—নাগজাতি গরুড়ের ভক্ষ্য এবং সে প্রতি অমাবস্যায় একটি মাত্র নাগ ভক্ষণ করিবে বলিয়া বিষ্ণুর নিকটে প্রতিশ্রুত এবং আমিও তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছি। পূর্বে সে যথেচ্ছ ভক্ষণ করিত এবং আমার অনুরোধে বিষ্ণু এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে প্রতি অমাবস্যায় একটি মাত্র নাগ ভক্ষণ করিয়া পরবর্তী অমাবস্যায় কে তাহার ভক্ষ্য হইবে জানাইয়া যায়, যাহাতে হতভাগ্য

মানসিকভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। বহু যাগ-যজ্ঞ করিয়াছি—ভক্ষ্যকে সূচীভেদ্য অন্ধকার লৌহনির্মিত প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত রাখিয়াছি। কিন্তু দৈববলে বলীয়ান খগরাজের জিঘাংসা হইতে কেহই নিস্কৃতি পায় নাই।

মাতলির চিত্ত দোদুল্যমান। এত প্রচেষ্টার পরে যদিও বা একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইলেন, তাহার আয়ু মাত্র সপ্তাহকাল !

নারদ বিষণ্ণ হইলেন। বিষণ্ণ মাতলি, বিষণ্ণ সমগ্র নাগসমাজও।

চিত্ত স্থির করিয়া তবুও মাতলি কহিলেন—নাগরাজ ! আমার হস্তে সুমুখকে সমর্পণ করুন। গরুড় আমার সখা—তাহার নিকটে ভাবী জামাতার জীবন প্রার্থনা করিব। ব্যর্থ হইলে যাইব দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর নিকটে। তাঁহারা গরুড়কে আদেশ বা অনুরোধ করিলে সে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। আমি আশাবাদী নাগরাজ।

এই সব শুনিয়া সুমুখের ম্লান মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। সন্দিগ্ধচিত্তে পরক্ষণেই নামিয়া আসিল ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার। তথাপি আশা ছলনাময়ী—যদি সফলতা আসে।

নাগরাজের সাগ্রহ অনুমতি লইয়া সুমুখ দেবর্ষি ও মাতলির সহিত স্বর্গপুরে যাত্রা করিল। আর মাত্র সপ্তাহকাল তাহার আয়ু ! যদি সফল হয় যদি সখা মাতলির অনুরোধ গরুড় ফিরাইতে না পারে ! বহু যুদ্ধে মাতলির অপূর্ব সারথ্যগুণে দেবরাজ জয়ী হইয়াছেন ; তিনি ঋণী —যদি মাতলি তাঁহার নিকটে ঋণ পরিশোধ প্রার্থনা করেন…এই আশা।

দেবর্ষি স্বর্গপুরে পৌঁছিয়া পূর্বেই মাতলিগৃহে সংবাদ দিয়াছেন। পরম রূপবান সর্বগুণসম্পন্ন রাজবংশসম্ভূত নাগকুমারকে পাত্ররূপে বরণ করিয়া মাতলি গৃহে ফিরিতেছেন ; কিন্তু—

এই 'কিন্তু' মর্মভেদী দুঃসংবাদের মত শোনাইয়াছে নবযৌবনা গুণকেশীর কর্ণে। দেবর্ষি জানাইয়াছেন পাত্রের সম্মুখে চরম বিঘ্ন। যদি দৈব অনুকুল হয় তবে আগামী অমাবস্যার পরে বিবাহ হইতে পারে। কি বিঘ্ন—কেন বিঘ্ন, দেবর্ষি কিছু বলিলেন না।

নাগকুমারকে সঙ্গে লইয়া মাতলি নিজপুরে প্রবেশ করিলেন। গবাক্ষ দিয়া নাগকুমারের কন্দর্পকান্তি রূপ এবং অমিততেজ কার্তিকেয়র মত সুঠাম বীর্যবান দেহ দেখিয়া গুণকেশী মুগ্ধ হইল। পিতার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। সে লক্ষ্য করিল পিতা ও নাগকুমার উভয়েই বিষণ্ণ, চিন্তিত—উভয়েই বাক্যহারা। কিন্তু কিসের বিঘ্ন ?

মাতলি পুরজনের কাছে সকল কথা হতভাগ্য সুমুখের ভবিতব্য এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের সংকল্পের কথা বলিলেন।

কন্যাকে জানাইলেন—এখন বিবাহ সম্ভব নয়—নিশ্চিত অকালবৈধব্য জানিয়া বিবাহ দেওয়া বিধেয় নয়। এখন গুণকেশী তাহার সহিত আলাপন বিশ্রম্ভালাপ করিয়া মনবেদনা লাঘবের চেষ্টা করুক। তিনি প্রথমে খগরাজের নিকটে যাইবেন—তাহার নিকটে ভাবী জামাতার প্রাণভিক্ষা করিবেন—ব্যর্থ হইলে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের নিকটে যাইবেন। জানেন না কি তার ভবিতব্য। সুমুখকে কন্যার নিকটে সমর্পণ করিয়া মাতলি গরুড়-আবাসে যাত্রা করিলেন।

সুমুখ ও গুণকেশীর আলাপন—সঙ্গদানের ভিতরে কোন প্রাণসঞ্চার হইল না। প্রথম প্রণয়মুগ্ধ ভাষা—কটাক্ষ—প্রিয় সম্ভাষণ সকলই অনুপস্থিত। উভয়েই ভীত সন্ত্রস্ত! সুমুখকে সঙ্গে লইয়া গুণকেশী সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করে, সুরেলা কণ্ঠে মধুসঙ্গীত শোনায়, নৃত্য-ছন্দে কানন ঝংকৃত করে। কিন্তু প্রাণ কোথায়? সবই যেন অভিনয়!

সেই ভয়ংকর মহানিশার মাত্র তিন দিবস অবশিষ্ট। মাতলি সংবাদ পাঠাইয়াছেন খগরাজের কাছে—আবেদনে তিনি ব্যর্থ। মাতৃ অবমাননায় গরুড় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে এক কল্পকাল নাগকুল ভক্ষণ করিবে, সেই কাল এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। মাতলি বিষ্ণুপুরে যাইতেছেন—ব্যর্থ হইলে সর্বশেষে ইন্দ্রের নিকটে যাইবেন।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে পুনরায় সংবাদ আসিল—ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রসভায় গিয়াছেন। মাতলির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি ইন্দ্রসভায় যাত্রা করিয়াছেন। হয়তো সেই স্থলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু সময় যে প্রায় অতিক্রান্ত!

অমাতিথির প্রভাত। বিহগকাকলীতে গুণকেশী শয্যা ত্যাগ করিল। সহসা মনে পড়িল তাহার পিতামাতা প্রতি প্রভাতে মধুসঙ্গীতে উষা-বন্দনা করেন। প্রভাতকে করেন আবাহন। কে এই উষাদেবী—গায়ত্রী! সাবিত্রী!!

ছুটিয়া মাতার নিকট যায় গুণকেশী! বলে, "মা—মা বল তুমি··· বিবাহিতা নারীর সীমন্তিনী দেবী কে? কে তাহাকে অকালবৈধব্য হইতে রক্ষা করেন? কোন সে দেবী? কোন মহিমময়ী?'

মাতা সুধর্মা আবেগে কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। বলেন—'তিনি ব্রহ্মাণী সাবিত্রী দেবী! সেই মহাসতীর শরণাপন্ন হও। কিন্তু তুমি যে অবিবাহিতা, তাহাকে ভজনা করিবার অধিকার তোমার নাই কন্যা!

গুণকেশীর সংকল্প স্থির। সে মাতার নিকট হইতে দেবী সাবিত্রীর বীজমন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে খগরাজের দূত শুকপক্ষী জানাইয়া গিয়াছে—অমারজনীর তৃতীয় পাদে সে আসিবে। সুমুখ যেন প্রস্তুত থাকে!

প্রস্তুত গুণকেশীও। মাতলি-কন্যা সারাদিন শুধু চিন্তা করিয়াছে। সংকল্পের পরিণাম যাহাই হউক—অন্ততঃ মৃত্যুর পূর্বে যদি সুমুখকে ক্ষণেকের জন্যও পরমানন্দ দান করিতে পারে—সেই হইবে তাহার অকালবৈধব্য জীবনের চিরসুখস্মৃতি।

গুণকেশী সারাদিন উপবাস করিয়া শুচিতা রক্ষা করিয়া দুইখানি অপরূপ মন্দার পুষ্পমালিকা প্রস্তুত করিয়াছে। সূর্যদেব অস্তগামী! সুমুখকে সঙ্গে লইয়া গুণকেশী পারিজাত পুষ্প কাননের এক পরিচ্ছন্ন স্থানে উপনীত হইল। শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলন করিল। স্বর্ণখচিত সিন্দুর পেটিকা মাতার কক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। সুমুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—'ঐ দেখ! রক্তাভ সূর্যদেব অস্তগামী—উভয়ে তাহাকে প্রণাম করি…এই লও একটি মালিকা, তোমার কণ্ঠে মাল্যদান করিয়া ধন্য হই। তুমি একটি মালিকা আমার কণ্ঠে পরাইয়া সূর্যদেব ও অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া আমাদের গন্ধর্ব মতের বিবাহকে সার্থক কর। তারপর দেবী সাবিত্রীর আশীর্বাদপূত এই সিন্দুর আমার সীমন্তে পরাইয়া দাও। আজ পরীক্ষা হইবে সতীতেজ, না খগরাজের জিঘাংসা—কোনটা বড়?'

গন্ধর্ব মতে বিবাহ হইল। ভাবলেশহীন হৃদয়ে শুধু গুণকেশীর আজ্ঞা পালন করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপত্নী রূপে বরণ করিল নাগকুমার সুমুখ। সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিল—'কেন তুমি এই কার্য্য করাইলে তুমিই জান। তোমার বৈধব্যকে রুদ্ধ করিবার কেউ নাই। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।'

আবেগজড়িত কণ্ঠে গুণকেশী বলিল—'মৃত্যুর আগে জানিয়া যাও তুমি তোমার কাম্যকে একান্তভাবে পাইয়াছিলে—চিরকুমারত্ব ভঙ্গ করিয়া পত্নী লাভে নিজেকে পূর্ণ করিয়াছিলে—তোমার সেই পরিতৃপ্তিই আমার বৈধব্য জীবনের পাথেয়। আমি স্থানত্যাগ করিব না। খগরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার নৃশংস কার্য নিরীক্ষণ করিব।

পুষ্পকাননে অমানিশার অন্ধকার। আকাশের বুকে হীরক খণ্ডের মত অসংখ্য তারকার দ্যুতিমালা। গুণকেশী একাগ্র চিত্তে দেবী সাবিত্রীর বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে পুষ্পবৃক্ষ তলে সমাধিস্থা। ক্রোড়ে মস্তক

স্থাপন করিয়া সুমুখ এক অদ্ভুত মোহগ্রস্ত অবস্থায় নিশ্চল শায়িত। অদূরে মাতলিপুরীতে কেহই নিদ্রিত নয়। সব নিস্তব্ধ। গুণকেশীর অনুরোধে সকলে তাহাকে একাকী রাখিয়া গিয়াছে। পুষ্পকাননে মৃত্যুদূতের পদসঞ্চারের জন্য প্রতীক্ষারত পুরবাসীগণ।

অমারজনীর তৃতীয় পাদ সমাগত। মাতলিপুরজন সুমুখের মৃত্যু আর্তনাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত। সহসা গরুড়ের বিশাল পক্ষমালায় নক্ষত্ররাজি আবৃত হইল। তাহার পর সুতীব্র আর্তনাদ। না—না এ দেব-মানব-নাগকণ্ঠের আর্তনাদ নয়! বজ্রভেদী আর্তনাদে মাতলীপুর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পুরবাসীগণ দেখিল—একটি বিশাল গগনস্পর্শী তেজপুঞ্জের দ্বারা গুণকেশী ও সুমুখের দেহ আবৃত। সেই স্থান হইতে লেলিহান অগ্নিশিখা বিচ্ছিন্ন হইয়া গরুড়ের প্রতি ধাবমান! অমর হইলেও গরুড়ের পক্ষদেশ দগ্ধ, চক্ষুযুগল প্রায় অন্ধ—চঞ্চু অর্দ্ধ বিগলিত—হৃদয়বিদারক আর্তনাদে গরুড় পলায়ন করিতেছে। তাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে তীব্র উজ্জ্বল ভয়াবহ অগ্নিগোলক।

কাহারো সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে গুণকেশীর সমাধিভঙ্গ হইল। সুমুখ সুপ্তোত্থিতের মত উঠিয়া বসিল। তাহারা শুনিল—অদৃশ্য দেবীকণ্ঠের মধুর আশ্বাস বাণী—'ওঠো মহাসতি! আমি পরিতুষ্টা দেবী সাবিত্রী। খগরাজ গরুড় তোমার সতীত্ব তেজের কাছে পরাজিত বিধ্বস্ত। তাহার সাধ্য নাই কোনদিন তোমার পতিকে স্পর্শ করে। তুমি চিরায়ুষ্মতী হও মা!'

অদৃশ্য দেবীকণ্ঠের বাণী মিলাইয়া গেল।

মাতলি উৎফুল্ল চিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দ্রপুরীতে বিষ্ণু ও দেবরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার প্রার্থনায় দেবরাজ বিষ্ণুর সহিত আলোচনান্তে—সুমুখকে অমরত্ব না দিয়া দীর্ঘ জীবন দান করিয়াছেন। তিনি আরও জানাইলেন যে লাঞ্ছিত বিধ্বস্ত গরুড় সুমুখকে বরদানের কথা জানিয়াও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ক্ষমতাকে তুচ্ছ করিয়া আস্ফালন করে। ক্রুদ্ধ বিষ্ণু গরুড়কে কঠোর শাস্তিদান ও লাঞ্ছিত করেন। তাঁহার নিকটে গরুড় এই প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হয় যে সে ভবিষ্যতে নাগভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সুমুখের সহিত চির সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইবে।

নব দম্পতী মাতলিকে প্রণাম করিল।

শ্রুবাবতী ও ইন্দ্র

পিতা! ক্ষণপ্রভা বজ্রদেবতা ইন্দ্রের কাহিনী আমাকে শোনাও।

কন্যার অনুরোধে সস্নেহে হাসিয়া বলেন মহর্ষি ভরদ্বাজ, তুমি নিদ্রা যাও কন্যা। একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি কেন তোমার এত ভাল লাগে জানিনা।

বালিকা কন্যা শ্রুবাবতী বলিল, না পিতা, কোন কাহিনীই বজ্রধর ইন্দ্রের কাহিনীর মত সুন্দর নয়।

ইন্দ্রের কাহিনী না শুনিয়া বালিকা নিদ্রিত হইবে না মহর্ষি জানেন, তাই বৃত্রাসুর সংহারের কাহিনী পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন—জলদ অধিপতি কখনো কখনো ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যদানব দলনের জন্য মহাশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। সেই বজ্রের বিচ্ছুরিত আলোকে ভুবন হয় উদ্ভাসিত। কখনও নিক্ষিপ্ত বজ্র হইতে স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণ-বিদারী ভীষণ শব্দে ভূতলে পতিত হয়। ইহাকে আমরা বজ্রপাত বলি।

মহর্ষির মুখে বৃত্রাসুর সংহারের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বালিকা নিদ্রিত হয়।

বর্ষাসমাগমে প্রতিনিয়তই বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার দিকে বালিকা শ্রুবাবতী। কল্পনা করে দেবরাজের অপরূপ রূপ এবং মহাশক্তির কথা। সে ভাবে, দেবরাজের চাইতে শক্তিধর কেহ থাকিতে পারে না। মহাবলী অসুরদের তিনি করেন দমন, তাই তাঁহার আর এক নাম পাকশাসন। দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র প্রভৃতির অসীম শক্তির কথা সে পিতার নিকট শুনিয়াছে; কিন্তু বজ্রের মত শক্তিধর অন্য কোন অস্ত্র যে থাকিতে পারে তাহা তাহার অবিশ্বাস্য।

শ্রুবাবতী মাতৃহীনা। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাহাকে পরম স্নেহে ও যত্নে লালনপালন করিতেছেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন—যখন আশ্রমে শিষ্যগণ সামবেদ গান গাহেন তখন মিত্র বরুণ ঊষা প্রভৃতির স্তবগানের সময়ে বালিকা শ্রুবাবতীকে দেখা যায় না, হয়তো সে সময়ে উদ্যানে ক্রীড়ারতা থাকে, কিন্তু ইন্দ্রের স্তব আরম্ভ হইবামাত্র সে উপস্থিত হয় গীতি-আসরে এবং পরম আগ্রহে বেদগানের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলিত করে।

বিশেষ এই স্তবটি তাহার কণ্ঠস্থ। মেঘগর্জনসহ ঘোর বর্ষাধারা নামিলে বাতায়ন পথে আকাশের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকে শ্রুবাবতী— উন্মনা হৃদয়ের আভাস প্রতিফলিত হয় তাহার মুখমণ্ডলে।

বালিকা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। তাহার বিবাহের কথা চিন্তা করিয়া একদা মহর্ষি তাহাকে কিরূপ স্বামী বরণীয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দিল শ্রুবাবতী, যিনি পাকশাসন—দুষ্টের দমন যাহার কর্ম, অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ করিয়া সমগ্র জীবের প্রাণদায়ী খাদ্য উৎপাদনের জন্য ধরণীকে যিনি শস্যশ্যামলা করেন, তিনিই তো শ্রেষ্ঠ দেবতা, তিনিই তো দেবতাদেরও অধীশ্বর স্বর্গের অধিপতি। আমি সেই বজ্রধর জলদ অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার স্বামীরূপে বরণ করিতে চাই।

মহর্ষি বলিলেন, তোমার এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হওয়া অসম্ভব। সুরপতি তোমাকে বিবাহ করিবেনই বা কেন? ইহা ছাড়া কোনো মানবীকে বিবাহ করিবার অধিকার তাহার নাই।

নম্রস্বরে শ্রুবাবতী বলিল, আমি তপস্যা করিয়া সুরপতিকে তুষ্ট করিব, আপনি শুধু তপস্যার আচরণবিধি আমাকে শিক্ষাদান করুন।

মহর্ষি শ্রুবাবতীকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে সংকল্পে অটল রহিল। মহর্ষি অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহাকে তপস্যা-বিধি শিক্ষা দিয়া বলিলেন, তোমার সংকল্প সিদ্ধ হোক। শুধু তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রকে পতিরূপে পাইবে না। নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সেবা, আতিথেয়তা, স্নেহ প্রভৃতি গুণগুলির পূর্ণ বিকাশ চাই। নীচতা, ক্রূরতা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি মানুষের দোষগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে—হৃদয়কে করিতে হইবে নির্মল। তপস্যাবিধি বড়োই সুকঠিন—প্রভাত হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন অনাহারে থাকিয়া একাসনে বসিয়া তপস্যা করিতে হইবে, সূর্যাস্তের পর সামান্য আহার্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এইরূপ বিধিনির্দেশ নির্দিষ্ট করিবার পর মহর্ষি আশ্রম ত্যাগ করিয়া একদা হিমালয়ে গমন করিলেন।

আশ্রমের অদূরে এক বিশাল শাল্মলী বৃক্ষের পাদমূলে বেদী নির্মাণ করিয়া শ্রুবাবতী কঠোর তপস্যা ও সাধনায় ব্রতী হইল।

দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য তাহার কঠোর তপস্যার কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল। কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ ঐ তপস্যাকে এক

উন্মাদিনীর খেয়াল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। তবুও শ্রুবাবতীর সংকল্পচ্যুতি হইল না।

প্রতিদিন সে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পর অনশনে সমগ্র দিবস সমাধিস্থ থাকিত, সূর্যাস্তের পরে সমাধিভঙ্গ হইলে কুটিরে ফিরিয়া শাকান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিত। কোনোদিন হয়তো কোনো করুণাময়ী আশ্রমবাসিনীর প্রদত্ত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া রাত্রি কাটাইত। এইরূপে দিনান্তে একবার সামান্য আহার্য গ্রহণ এবং কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে তাহার দেহ ক্রমে মলিন ও শীর্ণ হইতে লাগিল।

দিন যায়—মাস যায়—বর্ষ যায়। একদিন সন্ধ্যায় সমাধি ভঙ্গের পরই শ্রুবাবতী চক্ষু মেলিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে এক পরম রূপবান যুবক দাঁড়াইয়া আছে।

যুবকটি স্মিতহাস্যে কহিল, এই তপস্যার জন্য তুমি জগতে হাস্যাস্পদ হইয়াছ। আমি কোশল রাজকুমার—আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমার তুল্য রূপবান পুরুষ জগতে নাই। তুমি তপস্যা করিতেছ শুনিয়া এখানে আসিয়াছি এবং তোমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া করুণায় আমার মন ভরিয়া গিয়াছে। তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ কর—আমি তোমাকে যুবরাণী করিব। আমার রূপগুণ দেবরাজের অপেক্ষা কম নহে।

ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল শ্রুবাবতী, আপনার করুণার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি—কিন্তু আমি আপনার প্রার্থনায় সম্মতি দিতে পারি না। আমার জীবনের লক্ষ্য নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন। সুতরাং আপনি স্থানত্যাগ করুন।

যুবক মৃদুহাস্যে বলিল, ভাল, তুমি আজ সারাদিন অনশন ক্লান্ত—এখন তোমার আহার্য গ্রহণ ও বিশ্রামের সময়। আমি এক্ষণে চলিলাম, আবার আসিব।

ছদ্মবেশী দেবরাজকে শ্রুবাবতী চিনিল না। দেবরাজ তাহাকে সামান্য পরীক্ষা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন কথোপকথনের সময় শ্রুবাবতী সর্বদা মুখ নত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই। শ্রুবাবতীর এই কৌতুহল এবং ঈপ্সাশূন্য আচরণ দেবরাজকে প্রীত করিল।

সেদিন আকাশে ঘোর ঘনঘটা। প্রভাতকাল হইতেই বৃষ্টিপাত,

ঝঞ্ঝা এবং মুহুর্মুহু বজ্রপাত ধরাতলকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সমগ্র আশ্রমবাসীরা গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

এই দুর্যোগেও শ্রুবাবতীর সমাধিভঙ্গ হইল না। দেবরাজ ইন্দ্র তপোভঙ্গের জন্য তাঁহার চতুর্দিকে বারংবার বজ্রপাত করিতে লাগিলেন। পর্জন্যদেবকে আদেশ দিলেন দুরন্ত বায়ুর বেগের সহিত অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় তাপসীর সর্বাঙ্গ সিক্ত ও ক্লিষ্ট করিয়া দিতে। যেমন করিয়াই হোক তাপসীর তপোভঙ্গ করিতে হইবে।

কিন্তু দেবরাজের সকল প্রচেষ্টাই হইল ব্যর্থ। সন্ধ্যা হইলে স্বাভাবিক-ভাবে তপোভঙ্গ করিয়া শ্রুবাবতী নিজ কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সারাদিন তাহার দেহের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে প্রায় অবসন্ন সে। দুর্যোগবশত আজ কেহ তাহাকে ফলমূল দান করিতে আসে নাই।

এদিকে রন্ধনের জন্য সংগৃহীত কাষ্ঠসকল সিক্ত হইয়া গিয়াছে। রন্ধন করিবার শক্তিও শ্রুবাবতীর অন্তর্হিত। সে এদিন অভুক্ত থাকিয়াই শয়নের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় ইন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া গৃহদ্বারে ডাকিলেন, কে আছ গৃহে, আমি মহর্ষি বশিষ্ঠ। এই দুর্যোগে আমি বড়োই বিপন্ন।

ত্রস্তপদে বাহিরে আসিল তাপসী। মহর্ষিকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল।

স্বস্তিবাচনের পর মহর্ষিরূপী দেবরাজ বলিলেন, আমি সারাদিন অভুক্ত ক্ষুধার্ত, যদি আহার্য কিছু থাকে তবে আমাকে দাও।

ইহা শুনিয়া শ্রুবাবতীর মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। গৃহে আহারযোগ্য বর্তমানে কিছুই নাই। সামান্য একমুষ্টি তণ্ডুল হয়তো থাকিতে পারে, কিন্তু কাষ্ঠখণ্ডগুলি যে জলসিক্ত!

শ্রুবাবতীর বিব্রত আনন দেখিয়া দেবরাজ বলিলেন, আমার নিকট পাঁচটি অপক্ক বদর (কুলজাতীয়) ফল আছে, সঞ্চয় হিসাবে ঐগুলি কমণ্ডলুর ভিতর রাখিয়াছি। ফলগুলি ফুটন্ত জলে সুসিদ্ধ করিয়া দিলে আমার আহার সম্পন্ন হইবে। আমার নিকটে শুষ্ক অরনি কাষ্ঠও আছে। ইহার সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলন কর। তুমি যে কঠোর তপস্যা করিতেছ তাহা আমার অবিদিত নাই। এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের ফল তুমি অচিরেই লাভ করিবে। তপোবলেই সুরসেবিত দিব্যস্থানসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যাই মানবকে দেহান্তে দেবত্ব দান করে। এক্ষণে তুমি বদর ফলগুলি পাক কর, আমি অপর এক

তাপসের গৃহে বিশ্রম্ভালাপের জন্য যাইতেছি। অচিরেই ফিরিয়া আসিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিব।

মহর্ষিরূপী দেবরাজ বহির্গমন করিলে শ্রুবাবতী অরণিকাষ্ঠ লইয়া বহু আয়াসে সিক্ত রন্ধন কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া একটি মৃৎপাত্রে বদরফল সিদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রের মায়ায় ঐ বদরফল সিদ্ধ হইল না।

এমন সময়ে মহর্ষিরূপী দেবরাজ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, পাক এখনও শেষ হয় নাই দেখিতেছি—চিন্তা করিও না, আমি কার্যোপলক্ষ্যে কিছু সময়ের জন্য অন্যত্র যাইতেছি, যথাসময়ে ফিরিব। সংকুচিত ও ভীত না হইয়া নিজ কর্তব্য পালন কর। বদর ফল সুপক্ক করিতে পারিলে তোমার সকল মনোবাসনাই পূর্ণ হইবে।

শ্রুবাবতী জানিত দেবঅংশসম্ভুত মহর্ষি বশিষ্ঠের অবিদিত ও অসাধ্য কিছুই নাই। মনোবাসনা পূর্ণ করিতে তাহার পক্ষে প্রয়োজন এখন এই বদর ফল পক্ক করিয়া অতিথি সেবা করা।

শ্রুবাবতী ঐ কারণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সমগ্র রজনী কাটিয়া গেল। কর্তব্য সমাধার একাগ্রতায় সে প্রভাতে ইন্দ্রোপাসনার কথা বিস্মৃত হইল। তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রন্ধনকার্য সমাপন করিয়া অতিথিকে তৃপ্ত করা। কিন্তু তথাপি বদর ফল সিদ্ধ হইল না। মহর্ষি প্রদত্ত এবং গৃহের সঞ্চিত সমগ্র কাষ্ঠখণ্ডগুলি নিঃশেষিত হইবার পর আশ্রমের নিকটবর্তী অরণ্য হইতে আরও সিক্ত কাষ্ঠ যাহা পাইল তাহাই আনিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিতে দিতে লাগিল। শেষে তাহার পক্ষে আর কাষ্ঠ সংগ্রহ সম্ভব হইল না। উচ্চ বৃক্ষশাখায় আরোহণ করা তাহার অসাধ্য! নিরুপায় হইয়া অদ্ভুত সাহসিকতাপূর্ণ ভীষণ এক দুঃসাধ্য কার্য করিতে মনস্থ করিল। শ্রুবাবতী শুনিয়াছিল মানবদেহ চিতানলে দগ্ধ হইবার সময় শুষ্ক কাষ্ঠের মত প্রজ্বলিত হয়। ওদিকে দেখা গেল বদর ফল প্রায় সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে আর সামান্য অগ্নি পাইলে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে।

কাষ্ঠের অভাবে সে নিজের পদদ্বয় অগ্নির ভিতরে স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে পদদ্বয় শুষ্ক কাষ্ঠের মত প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তীব্র যন্ত্রনায় মুখ বিকৃত করিল না, অতিথির আহার্য অচিরে প্রস্তুত হইবে বুঝিয়া সকল যন্ত্রণা নীরবে নিষ্কম্পভাবে সহ্য করিতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া মূল দেহকে অনল স্পর্শ করিবার প্রাক্‌মুহূর্তে ফুটন্ত বদর ফল সুসিদ্ধ হইয়া গেল। ওদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব রূপী ইন্দ্রও দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

দগ্ধপদ শ্রুবাবতী মহর্ষিকে দেখিয়া নিষ্কম্প স্বরে কহিতে লাগিল, মুনিবর আপনার আহার্য প্রস্তুত। আমি দগ্ধপদ হইয়া চলৎশক্তিহীন হইয়াছি। আপনার আহার্য নিজে গ্রহণ করুন—আমি আপনাকে তৃপ্ত দেখিতে চাই।—

শ্রুবাবতীর নিষ্ঠা, ভক্তি ও আতিথেয়তার চমৎকারিত্বে দেবরাজ স্তম্ভিত হইলেন এবং নিজরূপ ধারণ করিয়া বর দান করামাত্র শ্রুবাবতীর পদদ্বয় পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইল। সে দেবরাজকে প্রণাম করিয়া অপলক নেত্রে তাহার এই উপাস্য দেবতা সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

দেবরাজ হাসিয়া বলিলেন, আমি তোমার তপস্যা ও আতিথেয়তায় বিস্মিত, মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট। তোমার সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব আমি। এই পৃথিবীর কোন মানব-সন্তানের স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকার নাই। যদি ইচ্ছা কর তবে আত্মাকে যোগবলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে চালিত করিয়া দেহত্যাগ কর! আমার স্বর্গরথ আসিয়া তোমার আত্মাকে অমরাবতীতে লইয়া যাইবে।

আনন্দবিহ্বলা শ্রুবাবতী দেবতার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দেবরাজ, আমাকে গ্রহণ করুন।

———



দশার্ণকুমারী ও শিখণ্ডী

সত্য বল তুমি পুরুষ, না নারী ?

আমায় ক্ষমা কর দশার্ণ রাজকুমারী—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নাই।

তুমি প্রতারক।

আর্তস্বরের ক্রন্দন শোনা যায় নারীকণ্ঠে ফুলশয্যার কক্ষাভ্যন্তরে। ভীত দাসদাসীগণ ছুটিয়া আসে—ছুটিয়া আসেন দ্রুপদরাজমহিষী। কক্ষের দ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যায় দ্রুপদরাজকুমার শিখণ্ডী।

যুবরাজ শিখণ্ডীর যৌবন সমাগমে বিবাহ হয় দশার্ণপতি হিরণ্যবর্মার কন্যার সহিত। দশার্ণপতি যখন এই বিবাহপ্রস্তাব প্রেরণ করেন তখন অস্বীকার বা প্রত্যাখান করিবার কোন পথ ছিল না। বিপুল পরাক্রমশালী দশার্ণপতির প্রস্তাব প্রত্যাখানের অর্থ চিরশত্রুতা সৃষ্টি—সংলগ্ন রাজ্যের সহিত বিবাদ, বিশেষ করিয়া হিরণ্যবর্মা যখন দ্রুপদ রাজার পরম বন্ধু। কিন্তু—

এই কিন্তুই তাহাকে চিন্তিত করিয়াছিল! পুত্রহীন দ্রুপদরাজ সন্তানলাভের আশায় মহিষীসহ মহাদেবের তপস্যায় নিরত হন। তাদের যুগ্ম কঠোর তপস্যায় ভবানীপতি আবির্ভূত হইয়া বরদান করেন: হে মহারাজ, অচিরে তোমাদের এক সর্বসুলক্ষণা কন্যাসন্তান লাভ হইবে।

ঐরূপ বর প্রাপ্তিতে বিচলিত হইয়া দ্রুপদরাজ ও মহিষী মহাদেবের পদতলে পড়িয়া বার বার পুত্রসন্তান প্রার্থনা করিলে মহাদেব বলিলেন, আমার বর মিথ্যা হইবার নহে। এই কন্যাসন্তানকে তোমরা পুত্ররূপে পালন করিবে। প্রবল সঙ্কটকালে এই কন্যা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহারথী যোদ্ধা হইবে এবং এর হস্তেই হইবে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিধন।

বরদানের ফল ফলিল। অচিরেই একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার জন্ম হইল। অপুত্রক রাজা রুদ্রদেবের বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া নবজাত শিশুকে পুত্ররূপে প্রচার এবং সকল প্রকার জাতকর্ম অনুষ্ঠিত করিলেন।

পুরুষ বেশ ধারণসহ পুরুষোচিত সকল বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিলেন।

নারী হইলেও রাজকন্যা নিজেকে পুরুষরূপে ভাবিতে শিখিলেন। অসিচালনা, ধনুর্বিদ্যা, রথচালনা ইত্যাদি সকল বিষয়েই কৃতী হইলেন। এমন সময় আসিল তাহার বিবাহপ্রস্তাব।

মহিষী কহিলেন, ত্রিলোকনাথ ভগবান শূলপানির বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। তিনি নিস্ফল বরদান করিবেন—ইহা অসম্ভব। সুতরাং বিবাহে সম্মতি দান করুন। পাত্রী এখন বালিকামাত্র। বিবাহের পরে তাহাকে পিতৃগৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করুন। যৌবন সমাগমে বধূকে স্বামীগৃহে আনিবার ব্যবস্থা করা হইবে। সময় আসন্ন হইলে নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটনায় অসম্ভব সম্ভব হইবে।

রাজা দ্রুপদ অতঃপর সম্মতি দিলেন। তাহার পর বধূর যৌবন সমাগমে বাধ্য হইয়া পুত্রবধূকে আনয়ন এবং শুভলগ্নে প্রথম মিলনের ফুলশয্যার আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতেই এই বিপত্তি।

রাজমহিষীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীব্র তিক্তস্বরে দশার্ণকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, বলুন মাতা আপনার পুত্র পুরুষ না নারী। তার শ্মশ্রুশূন্য মুখমন্ডলে নারীত্বের পূর্ণরূপের বিকাশ। সজ্জিত বক্ষাবরণতলে সমুন্নত নারীত্বের গৌরব। কণ্ঠস্বরে কোকিলের কলগুঞ্জন। এ কখনও পুরুষে সম্ভবে না। তাই সত্য বলুন মাতা—আপনার সন্তান পুরুষ না নারী!

মহাদেবের বরদানের কথা স্মরণ করিলেন রাজমহিষী—সংকটকালে কন্যা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধীর শান্তস্বরে উত্তর দেন রাজমহিষী, শিখণ্ডী আমার পুত্র।

লজ্জা—নিরাশা—নারীত্বের ব্যর্থতা—আবেগ সব কিছু মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, হর্মতলে মূর্ছিত হইয়া পড়ে দশার্ণকুমারী। জীবনের এতাবত সঞ্চিত কত মধুর স্বপ্ন—কত আশা—সব বিলুপ্ত হইয়া যায় নৈরাশ্যের অন্ধকারে। প্রভাতেই দশার্ণকুমারী পত্র দ্বারা এই অদ্ভুত প্রতারণার কথা গোপন পথে পিতাকে জানাইল।

বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মা কন্যার পত্র পাইবামাত্র বিশাল সৈন্যসজ্জা করিয়া দ্রুপদ রাজ্য সীমান্তে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া চরমপত্র পাঠাইলেন বৈবাহিককে।

একজন ব্রাহ্মণ ঐ পত্র লইয়া দ্রুপদনগরে অগ্রসর হইলেন সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য।

কিন্তু কোথায় শিখণ্ডী! সমগ্র রাজপুরী, রাজধানীর সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানেও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সে গৃহত্যাগী—পলায়িত।

পিতার আচরণ, দশার্ণকুমারীর মর্মভেদী অভিযোগ—এই সবের লজ্জা তাহাকে দিশাহারা করিয়াছে। দেহত্যাগ করা ছাড়া সঙ্কটমুক্তির আর কোন উপায় সে দেখিতেছে না। গভীর বনভূমির ভিতর দিয়া লক্ষ্যহীন উদাসভাবে সে চলিয়াছে। জীবনে প্রথম পুরুষবেশ ছাড়িয়া আজ সে নারীবেশ ধারণ করিয়াছে। পুরুষ বেশের আর প্রয়োজন কোথায়? নারীত্বের আবেগ, প্রেম, ভালবাসা, স্বামীলাভ এবং গৃহসংসারের সকল স্বপ্নই সে শয়নকালে দেখিত ও নিজের ছদ্মবেশকে ছলনাময় মনে করিত! যৌবন সমাগমে নারীত্বের সকল কলিই তাহার দেহমনে বিকশিত হইয়াছিল। তাহার প্রতি পিতামাতার এই আচরণের মূল হেতু কি, তাহা তাহার অজ্ঞাত। অপুত্রক পিতা কন্যাকে পুত্ররূপে সজ্জিত করিয়া বিবাহ দিয়া চরম সামাজিক অপরাধ করিয়াছেন। কন্যার বিকশিত যৌবনকে নিজের কোন্ খেয়ালে অবজ্ঞা করিয়াছেন তাহা সে বুঝিতেছে না।

সে আজ আর শিখণ্ডী নয়—শিখণ্ডিনী। ঘুচে যাক্ অতীত। সে নারী—নারীত্বকে সে আর অস্বীকার করিবে না। অভিমানে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। এই ব্যর্থ জীবন সে পরিত্যাগ করিবে, দশার্ণকুমারীকে সে দিবে চিরমুক্তি। অসিদ্ধ বিবাহ আপনা হইতেই বিচ্ছিন্ন হইবে। মনে পড়িতেছে ফুলশয্যার রাত্রির কথা—ক্রীড়াবনতা যুবতির প্রথম প্রেম নিবেদনের আকুলতা। ভয় ও আনন্দের যুগপৎ মিশ্রণের সেই অপরূপা মোহময়ী রূপ নারী হইয়াও তাহার চিত্তকে করিয়াছিল মুগ্ধ—বিচলিত।

গভীর অরণ্যের এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইল নারীবেশী শিখণ্ডিনী। অনাহারে—প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে। এখন এই জীবনের কোনই সার্থকতা নাই—সবই যেন প্রতারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

দিন কাটিতেছে। অনাহারে দ্রুত অমৃতলোকের পথে অগ্রসর হইতেছে নবীন তপস্বিনী। এই বনভূমি যক্ষপতি কুবেরের সম্পদ এবং বনরক্ষক কুবের অনুচর স্থূণাকর্ণ।

স্থূণাকর্ণ ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে নির্জন হিংস্র শ্বাপদশঙ্কুল বনভূমিতে কঠোর তপস্যারতা অসামান্যা সুন্দরী রমণী দেখিয়া ঘোরতর বিস্মিত হইল।

সুন্দরী সমীপে অগ্রসর হইয়া স্থূণাকর্ণ বলিল, কে তুমি অনিন্দিতে! আমার রক্ষিত বনভূমিতে তপস্যায় দেহবিসর্জনে ব্রতী। তুমি যুবতী—অসামান্যা সুন্দরী! কি তোমার দুঃখ—কি তোমার বেদনা। আমি ধনপতি কুবেরের বনরক্ষক স্থূণাকর্ণ। আমার সাধ্য হইলে আমি তোমার দুঃখ দূর করিয়া তোমাকে সুখী করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

ক্ষীণস্বরে উত্তর দেয় শিখণ্ডিনী, অসম্ভব বন্ধু—অসম্ভব। আমার দুঃখের কথা শুনিলে বুঝিবে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা অসম্ভব। এতই গুরুতর আমার সমস্যা যে একমাত্র মৃত্যুই আমাকে ভারমুক্ত করিতে পারে।

সকল কথা শুনিয়া স্থূণাকর্ণ বলিল, আমি যক্ষ। আমরাও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবঅংশের অধিকারী। তোমার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে উভয়ের পুরুষত্ব ও নারীত্ব বিনিময় করিতেছি। প্রয়োজন ফুরাইলে আবার এই স্থানে আসিও—পূর্বরূপ পরস্পর ফিরিয়া পাইব। আমি বরদান করিতেছি—তোমার বিপদমুক্তি হোক—শুভমস্তু।

স্থূণাকর্ণের ঐকথা শোনামাত্র শিখণ্ডিনীর সর্বদেহে শিহরণ বহিতে লাগিল। সমগ্র দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—শিরা উপশিরায় প্রবল বেগে রক্ত সঞ্চালন হইতেছে! সর্বদেহে প্রবল আক্ষেপ, উচ্ছ্বাস ও কম্পনের বেগ ও আক্ষেপ দ্রুত সঞ্চারিত হইতেছে। তপস্যাক্লিষ্ট দেহে এই শিহরণ সহ্য করিবার শক্তি তাহার নাই। শিখণ্ডিনীর সংজ্ঞালুপ্ত হইল।

তিন দিবস পরে শিখণ্ডিনীর সংজ্ঞা ফিরিল। বিস্মিত হইয়া দেখিল এক অসামান্যা সুন্দরী যক্ষবালা তাহার পরিচর্যা করিতেছে। ধীরে ধীরে সকল কথা তাহার স্মরণে আসিল।

জ্ঞান ফিরিয়াছে দেখিয়া যক্ষবালা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বন্ধু, তুমি এখন অমিতবীর্যশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ।

শয্যা হইতে চকিতে উঠিয়া বসিল শিখণ্ডিনী। নিজ অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিল সে এখন নারী নয়, প্রকৃতই শিখণ্ডী। নারীত্বের যৌবনশ্রী লুপ্ত হইয়া বক্ষে পেশীবহুল পৌরুষের মাধুর্য ফুটিয়াছে। বাহুতে অসীম বল সঞ্চারিত হইয়াছে—যেন একটি হস্তীকেও পরাজিত করিতে পারে। রূপে কন্দর্প, বীর্যে কার্তিকেয়, জ্ঞানে— !

তাহাকে প্রফুল্ল দেখিয়া যক্ষবালা বলিল, বন্ধু, তোমার রাজ্যে এখন অসীম সঙ্কটকাল। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মা তাহার কন্যার বিবাহে প্রতারণার সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে দ্রুপদরাজ্যের সীমান্তে সৈন্য

সাজাইয়া নিজে স্কন্ধাবারে অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র দেশবাসী তোমাকে খুঁজিতেছে। একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশার্ণরাজের প্রতিভূরূপে দ্রুপদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছে। দ্রুপদরাজ ও মহারাণী দৃঢ়ভাবে নিজের সন্তানকে পুত্ররূপে প্রচার করিতেছেন। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। ঐস্থানে ফিরাইবার জন্য আমি এখন তোমাকে পুরুষবেশে সাজাইয়া দিতেছি।

উল্লসিত শিখণ্ডী যক্ষপ্রদত্ত পুরুষবেশ ধারণ করিল। মস্তকে দ্যুতিমান ডিম্বাকৃতি হিরকখচিত উষ্ণীষ, দেহে হীরা মনিমাণিক্য খচিত রত্নমালার আভরণ এবং সঙ্গে রহিল দেবদুর্লভ বস্ত্র ও সজ্জা!

নববেশে সজ্জিত শিখণ্ডী পুনরায় নিজেকে নিরীক্ষণ করিল দর্পণে। নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই স্তম্ভিত হইল সে। প্রকৃতই সে আজ মদনদেব ও কার্তিকেয়র মিলিত রূপগুণের প্রতীক।

শিখণ্ডী বলিল, এইবার যাই বন্ধু, এই মহাবিপদে পিতা ও দ্রুপদরাজ্য রক্ষা করিয়া আবার ফিরিব। অচিরেই আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বন্ধু।

বীণানিন্দিত কণ্ঠে বলিল যক্ষবালারূপী স্থূণাকর্ণ, তার আর প্রয়োজন নাই সখা। আমার কৃতকর্মের জন্য আমি যক্ষপতি কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত। তোমার মৃত্যুর পরে আমি পুরুষত্ব লাভ করিব। তুমি হইবে অমিতবিক্রমশালী মহারথী; তবে, তুমি যদি কথা দাও আমি কিছু প্রার্থনা করি তোমার কাছে—

তোমার কোনো প্রার্থনাই আমার অদেয় নাই বন্ধু, বল কি তোমার প্রার্থনা?

মৃদু সলজ্জ হাসিয়া বলিল যক্ষবালারূপী স্থূণাকর্ণ, তুমি আমার দেখা প্রথম পুরুষ। তোমাকে ভালবাসিয়াছি—আমি তোমাকে চাই। তোমার বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনে আমায় একবার তুষ্ট কর, আমি চাই তোমার ওপর শুধু ক্ষণেকের অধিকার।

নিবিড় আলিঙ্গনে যক্ষবালাকে বদ্ধ করিল প্রথম পুরুষরূপী শিখণ্ডী। রোমাঞ্চকর এক অদ্ভুত আনন্দময় শিহরণ বহিয়া গেল সর্বদেহে। এই আনন্দ চির শাশ্বত—চির মধুর, মধ্যাহ্ন সূর্যের মত ভাস্বর—পূর্ণিমার চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ মায়াময়।

দ্রুপদ রাজার অন্তঃপুরে মহাসমারোহে রচিত হইল নূতন ভাবে ফুলশয্যা। অশোক, মল্লিকা, পলাশ, শিরীষ, মাধবী প্রভৃতি বসন্তের

ফুলসম্ভার দিয়া রাজরাণী নূতন করিয়া হাসিমুখে ফুলশয্যার সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু নায়িকা দশার্ণকুমারী—তাহার হৃদয় দ্বিধাসংশয়পূর্ণ, উদ্বেগে তাহার কণ্ঠ শুষ্ক। পিতা তাহাকে মিথ্যা সংবাদ দানের জন্য কঠোর তিরস্কার করিয়া বৈবাহিক দ্রুপদ রাজার নিকটে নিজের হঠকারিতার জন্য বারবার মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছেন।

দশার্ণকুমারী বিস্মিত, শঙ্কিত, আনন্দিত। পূর্বধারণা মিথ্যা হউক ইহাই তাহার কামনা। সে আকুল হৃদয়ে ফুলসাজে নিজেকে রতিসমা করিয়া সংশয়িত প্রতীক্ষায় রত।

ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল যক্ষবালা প্রদত্ত অপরূপ বেশধারী যুবরাজ শিখণ্ডী। অপূর্ব রূপ, অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত দেহসৌষ্ঠব—মুখে স্মিত হাসি, চোখে কৌতুক বিভা। অপরূপ এই পুরুষের দিকে দশার্ণকুমারী বিস্ময় বিহ্বল চক্ষে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তারপর দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আকুল আবেগে লুটাইয়া পড়িল যুবরাজের বিশাল বক্ষে।

তাহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল অস্ফুট স্বর—স্বামি, আমায় ক্ষমা কর।



রুরু ও প্রমদ্বরা

অপ্সরা কন্যা প্রমদ্বরা।

পিতা মাতার স্নেহ হইতে সে চিরবঞ্চিত। সে শুধু জানিয়াছে তাহার পিতা গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও মাতা স্বর্গোপ্সরা মেনকা। তাহাদের এক রাত্রির মধুমিলনের ফসল সে।

জন্মের পরেই মাতা সদ্যজাত কন্যাকে গোপনে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের এক কোণে রাখিয়া পলায়ন করে। শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া মহর্ষি তাহাকে পরম আদরে গ্রহণ করেন এবং পত্নীকে বলেন ঐ কন্যাকে নিজ কন্যারূপে প্রতিপালন করিতে। মহর্ষির কোন সন্তান ছিল না।

বিচিত্র এই অপ্সরাকুল। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হন চিরজীবনদায়িনী অমৃত সহ চিরকল্যাণময়ী লক্ষ্মী। আর সেই সঙ্গে উত্থিত হয় কামনার হলাহল লইয়া একদল অপরূপ রূপবতী রমণী—উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, মিত্রকেশী, সুপ্রিয়া ও আরও অনেকে। ইহারা সকলেই কুন্দশুভ্র দিব্যজ্যোতির্ময় চিরযৌবনা। ইহাদের দেখিবামাত্র দেবতাদের হৃদয় হয় চঞ্চল—অসুরগণ হয় বিচলিত। এখনই হয়তো এই অঙ্গনাদের লইয়া দেবাসুর সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। এইরূপ অনুমান করিয়া তখন পরমপিতা ব্রহ্মা নিয়ম করিলেন—ইহারা হইবে সর্ব-দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, এমনকি মানবভোগ্যা স্বৈরিণী। সুর সভাতলে নৃত্যগীত হইবে এদের প্রধান করনীয়, কিন্তু কাম বিষয়ে ইহারা হইবে সর্ববাধাহীন সাধারণ্যা। ইহাদের হৃদয়ে থাকিবেনা প্রেম, ভালবাসা, কর্তব্যবোধ—চিরযৌবনা হইয়া বিলাস আর ছলনায় জীবন অতিবাহিত করিবে। আর ইহাদের অবিবাহজাত সন্তানেরা হইবে সমাজ স্বীকৃত।

অপ্সরী পরিত্যক্তা কন্যা পরম আদরে আশ্রমে শশীকলার মত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে পাইল মাতৃরূপ। মাতৃগুণের অধিকারী হইয়া হইল পরমাসুন্দরী নৃত্যপটিয়সী। সঙ্গীতসাধক বিশ্বাবসু তাহার পিতা। তাই সঙ্গীত শাস্ত্রেও অসামাণ্য নিপুণতা প্রকাশিত হইল তাহার কণ্ঠে। শিশুকাল হইতেই নৃত্যগীত দ্বারা আনন্দমুখর করিয়া

তুলিল নীরস আশ্রমের পরিবেশ। এই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা প্রমদাগণের শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় মহর্ষি তাহার নাম রাখিলেন প্রমদ্বরা।

অন্যদিকে অনুরূপ অপর একটি মধুমিলন ঘটিয়াছিল। চ্যবনপুত্র প্রমতি ব্রহ্মচর্য পালনের পর পিতার অনুমতি লইয়া বনভূমিতে তপস্যায় রত ছিলেন। সেই সময়ে স্বর্গোপ্সরা ঘৃতাচী ঐ পথ দিয়া যাইবার কালে ঐ পরম রূপবান তপস্যারত যুবককে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানা ছলাকলায় প্রমতির তপোভঙ্গ করিয়া তাহার অঙ্কশায়িণী হইল। এই মধুমিলনের ফলে ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির এক পুত্র জন্মিল। ঘৃতাচী সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে পিতৃক্রোড়ে রাখিয়া নবলীলার সন্ধানে প্রস্থান করিল। প্রমতি এই পুত্রের নাম রাখিলেন রুরু।

প্রমতি অতি রূপবান ছিলেন। তদুপরি অপ্সরার গর্ভজাত হওয়ায় রুরু পুরুষ সৌন্দর্যের এক আদর্শরূপে পরিগণিত হইল। যেন লক্ষ্মীসুত মনসিজ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।

যথাযথ শিক্ষাসংস্কার ইত্যাদি সমাপ্ত হইবার পর যৌবন সমাগমে রুরুর বিবাহের জন্য প্রমতি উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রমতি বিশেষ প্রয়োজনে রুরুকে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে প্রেরণ করিলেন এবং রুরু আশ্রমের নিকটবর্তী পুষ্পকাননে পুষ্পচয়নরতা প্রমদ্বরাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। অদ্যাবধি এমন অপরূপা সে দেখে নাই। বিহ্বল হৃদয়ে এক বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া অঙ্গনার রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

সহসা কপোতকপোতীর কলগুঞ্জনে আকৃষ্ট হইয়া প্রমদ্বরা মুখ তুলিতেই চারিচক্ষের মিলন হইল।

বিস্মিত প্রমদ্বরা কহিল, কে আপনি মহাত্মন্ আশ্রম দ্বারে? আমার পিতা স্থানান্তরে গিয়াছেন, দুই দিবস পরে ফিরিবেন।

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রুরু বলিল, আমি প্রমতিনন্দন রুরু। আপনার পরিচয়?

আমি মহর্ষি স্থূলকেশনন্দিনী প্রমদ্বরা। বলুন কি আপনার প্রয়োজন, আমি পিতাকে জ্ঞাপন করিব।

ধীর কণ্ঠে রুরু বলিল, সত্যিই তুমি নারীশ্রেষ্ঠা প্রমদ্বরা। আমার ইচ্ছা তোমার হস্তের রচিত পুষ্পমাল্য আমার কণ্ঠে শোভিত হোক।

লজ্জায় সঙ্কোচে আরক্ত হয় ঋষিকুমারী। এত অসঙ্কোচে হৃদয়ের বলিষ্ঠ আবেদন কোন যুবাপুরুষের নিকট হইতে শোনে নাই

সে। যুবকের কন্দর্পসম রূপ দেখিয়া নবীনা হয় মোহিত। তাহার চিত্ত হয় চঞ্চল। তবুও সসঙ্কোচে সে বলিল, না ভদ্র, আমি পিতার অধীন, আপনি প্রত্যাগমন করুন, আমার পিতা এখন গৃহে অনুপস্থিত।

আবেগভরে রুরু কহিল, আমি যাইতেছি বটে, শুধু জানিতে চাই তোমার মনোভিলাষ—আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে কি সম্মত আছ?

রক্তিমাভা ধারণ করিল প্রমদ্বরার কুন্দশুভ্র মুখমণ্ডলে। স্মিতহাস্যে সে সংগৃহীত পুষ্পরাশির মধ্য হইতে অর্দ্ধসমাপ্ত মালাখানি রুরুর বক্ষোপরে নিক্ষেপ করিয়া সসঙ্কোচে দ্রুত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে স্বস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল রুরু। নারীচরিত্র তাহার অজানা। অসমাপ্ত মালাখানি স্বীয় কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া অতঃপর ধীরে ধীরে সে নিজ আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সহসা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল গবাক্ষে দাঁড়াইয়া আছে অনিন্দিতা—তাহার চক্ষুর চাহনীতে যেন আশার আশ্বাস।

ইহা দেখিয়া তাহার হৃদয়ে জাগিল এক অজানা আনন্দময় অনুভূতি। ইহা যে প্রথম প্রেমের মধুর অনুভবের বিকাশ তাহা সে জানিত না। হৃষ্ট অথচ চিন্তাকুল চিত্তে আশ্রমে ফিরিল রুরু।

রুরুর বয়স্যদের নিকট পুত্রের বাসনা জানিয়া প্রমতি হন আহ্লাদিত। তিনি প্রমদ্বরার জন্মবৃত্তান্ত জানিতেন। উভয়েই অপ্সরা সন্তান—যেন অজানা কোন সূত্র তাহাদের একত্রে বাঁধিতে চায়। তিনি সাগ্রহে মহর্ষি স্থূলকেশের নিকট প্রমদ্বরাকে স্নুষার্থ কামনা করিয়া প্রস্তাব নিবেদন করিলেন। স্থূলকেশ পত্র পাইয়া সাগ্রহে কন্যার অভিমত জানিতে চাহিলেন। সলজ্জ হাস্যে সম্মতি জানাইল কন্যা প্রমদ্বরা। আশ্রমবাসীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বহিল।

মহর্ষি স্থূলকেশের জায়া পূর্বেই গত হইয়াছিলেন। পূর্বাপর চিন্তা করিয়া তিনি আর্ষ বিবাহের পরিবর্তে সর্বোত্তম প্রাজপত্য বিবাহ দিবেন ভাবিলেন। কিন্তু ইহার ব্যবস্থাপনার আয়োজন করা পত্নী-হারা তাহার একার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই তিনি পত্রোত্তরে সব কথা জানাইয়া বিবাহের সপ্তাহকাল পূর্বে কন্যাকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য প্রমতিকে অনুরোধ করিলেন। আগামী শুক্লপক্ষে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত পূর্ণিমার গোধূলি লগ্নই প্রশস্ত উল্লেখ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। জানাইলেন বিবাহকালে যথাসময়ে তিনি অবশ্যই উপস্থিত হইয়া নিজহস্তে একমাত্র কন্যাকে রুরুর হস্তে সমর্পণ করিবেন।

সুসজ্জিতা প্রমদ্বরা সখিগণ পরিবৃতা হইয়া যথাকালে মহর্ষি প্রমতির আশ্রমে গমন করিল। উভয় আশ্রমবাসী মহিলাগণ পরম আনন্দের সহিত বিবাহের আয়োজনে রত হইলেন।

সেদিন এক বসন্তপ্রভাত উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত পূর্ণিমাকে সঙ্গিনী করিয়া আবির্ভূত হইল। দিকে দিকে অশোক পলাশের সহিত যূথিকা-মল্লিকা-চামেলীর মধুমিলন দেখা যাইতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কোকিলের কুহুস্বরের মধুসম আবাহন যেন বলিতেছে—জাগো জাগো লগ্ন সমাগত।

ঊষাকাল হইতেই বালিকা কিশোরী যুবতী—সকলেই পুষ্পচয়নে রত। তাহারা দরিদ্র—রত্নালংকার বিভূষিতা কন্যাদান কল্পনা করেনা। তাহাদের নিকট ফুলদলে গ্রথিত সজ্জা অনেক মনোরম—অনেক হৃদয়গ্রাহী। প্রমদ্বরাও সখিদের সহিত পুষ্পচয়নে রত হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় তাহার জীবনে আসিবে এক নব পরিচয়—সে হইবে বধূ, সখি, জায়া, ভার্যা—এক পুরুষের চিরজীবন সঙ্গিনী।

প্রমতিনন্দন রুরুও গৃহে নাই। ঊষাকালে সখাদের সহিত নগরে গিয়াছে প্রাজপত্য বিবাহের নানা উপাচার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। গত এক সপ্তাহ ধরিয়া সংগ্রহ করিয়াছে নিমন্ত্রিত সমগ্র আশ্রমবাসীদের উপযোগী তণ্ডুল, গোধুম, তৈল, ঘৃত, নানাপ্রকার ফল ও কাষ্ঠসম্ভার।

ওদিকে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুও প্রমদ্বরার বিবাহের সংবাদ রাখিয়াছেন, এতদিন স্বীয় কন্যার প্রতি কোন কর্তব্য পালন না করার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি রাজকন্যার বিবাহের উপযোগী নানা রত্নালংকার, সজ্জা, বস্ত্র এবং আশ্রমবাসীদের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদিসহ একজন অনুচর প্রেরণ করিলেন। সেই সঙ্গে উভয় মহর্ষিকে দুইখানি স্বতন্ত্র পত্রে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন যে তিনি স্বয়ং বিবাহবাসরে উপস্থিত হইয়া বরকন্যার দীর্ঘ সুখময় জীবনের জন্য আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সমগ্র দ্রব্যসম্ভার লইয়া গন্ধর্বরাজের অনুচর প্রভাতেই প্রমতির আশ্রমে উপস্থিত হইল। এমন সময় ঘটিল এক অভাবিত দুর্ঘটনা।

প্রমদ্বরা সখিদের সহিত পুষ্পকাননে সেদিন পুষ্পচয়নে রত ছিল। সেই সময় হঠাৎ সে অসাবধানে এক মৃত্যুরূপী কৃষ্ণসর্পকে পদদলিত করিল। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ তৎক্ষণাৎ দংশন করিল তাহাকে। সখিগণ সর্পদংশিত প্রমদ্বরাকে দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কাল ভুজঙ্গের দংশন ব্যর্থ হইল না।

প্রমদ্বরার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ কিয়ৎক্ষণপরেই বিষক্রিয়ায় কৃষ্ণরূপ ধারণ করিল এবং গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সখিদের আর্তনাদ শুনিয়া সমবেত ঋষিগণ ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! মৃতকে পুনর্জীবন দানের ক্ষমতা তাহাদের নাই! আনন্দময় আশ্রম মুহূর্তে শোকাচ্ছন্ন বিষাদপুরীতে পরিণত হইল।

ইতিমধ্যে রুরু সর্বোপচার লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া এই ভয়ংকর সংবাদ শুনিয়াই উন্মত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। আত্মগতভাবে বলিতে লাগিল—আমার জীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু মৃতাকে আমি দান করিতেছি। যদি সত্যই আমার জীবন নিস্কলংক পবিত্র হয়, মিথ্যাবচন মিথ্যাচরণ এবং গুরুজন প্রতি অশ্রদ্ধা যদি কোনদিন না করিয়া থাকি তাহা হইলে প্রমদ্বরা আমার অর্দ্ধেক পরমায়ু লইয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হো'ক।

সকলই বিফল হইল। শুধু ক্রন্দন রোল ছাড়া আশ্রমে আর কিছু শোনা গেল না।

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু কন্যার বিবাহে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অনুচর আসিয়া তাহাকে ঘোর দুঃসংবাদ প্রদান করিল। শোকাহত গন্ধর্বরাজের মনে পড়িল মৃত্যুপতি ধর্মরাজ যম তাহার প্রিয় সখা। জীবনে তাহার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করেন নাই। তৎক্ষণাৎ যমলোকে উপনীত হইয়া কন্যার জীবন প্রার্থনা করিলে ধর্মরাজ বলিলেন, প্রমদ্বরার আয়ু ফুরাইয়াছে—তাহার পুনর্জীবন দান করা অসম্ভব। তবে বন্ধুকন্যা হেতু একটিমাত্র উপায় করিতে পারেন।

কি সে উপায়? সাগ্রহে বিশ্বাবসু জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধর্মরাজ বলিলেন, রুরু যদি সর্বান্তকরণে তাহার অর্দ্ধেক পরমায়ু প্রমদ্বরাকে দান করিতে প্রস্তুত থাকে তবে প্রমদ্বরা বিষমুক্ত হইয়া- পুনর্জীবন লাভ করুক।

মৃতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুরু তখন ঐ প্রার্থনাই করিতেছিল। ফলে ধর্মরাজের বাক্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেষ্টিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে প্রমদ্বরা চক্ষু মেলিল। এতক্ষণ যেন সে নিদ্রিত ছিল। সকলকে তাহার চারিপার্শ্বে শোকাকুল সাশ্রুনয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইল।

আশ্রমে আবার আনন্দের বন্যা বহিল। গোধূলী লগ্নের এখনও দেরী আছে। স্থূলকেশ, কঠ, গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ পূর্বেই ঐস্থানে সমবেত ছিলেন। অনতিবিলম্বে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু তথায় পেঁাছিলেন।

গোধূলি লগ্নে বিবাহ সমাপ্ত হইল। বিশ্বাবসুও সারারাত্রি ধরিয়া উৎসবে যোগ দিলেন এবং কন্যা-জামাতাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মৃতা কন্যার পুনর্জীবন প্রাপ্তির মূল রহস্য অবশ্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিলেন না।

পরদিবস প্রভাতে প্রস্থানের সময়ে এক রক্তরাঙ্গা পুষ্প সমাচ্ছন্ন অশোকতরুর নিকটে কন্যাকে লইয়া গিয়া বিশ্বাবসু বলিলেন, এই অশোকতরুকে সদা যত্ন করিবে। প্রতি বৎসরে পুষ্পসমাগমের সময়ে এই বৃক্ষতলে সাবিত্রীব্রত পূজা ও নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনা করিবে। যদি কোন বৎসরে বসন্তকালে লক্ষ্য কর যে অশোকতরু পুষ্পশোভিত হয় নাই, বৃক্ষশাখে কোকিলের কুহুরব শোনা যাইতেছে না, পত্রসকল শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, তখন সর্বদা পতির পাশে পাশে থাকিবে। সে বৎসরের ফাল্গুনী পূর্ণিমা রজনীর তৃতীয় প্রহর বড়ই দুঃসময় তোমাদের পক্ষে। উভয়ে যেন বিচ্ছিন্ন না হও সেই দিন—সেই রাত্রিতে।

ইহা বলিয়া অতঃপর গন্ধর্বরাজ প্রস্থান করিলেন।

আনন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল নব দম্পতির। নবীন জীবনসুধায় উভয়ের হৃদয় হইল তৃপ্ত। যায় মাস—যায় বর্ষ। প্রমদ্বরা প্রতিদিন প্রভাতে অশোকবৃক্ষতলে জলসেচন, পুষ্প সমাগমের সময়ে সাবিত্রী ব্রত পালন, ইত্যাদি পিতার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিল।

এইরূপে প্রায় পঞ্চদশ বৎসর দেখিতে দেখিতে অতিক্রান্ত হইল। একদিন সহসা প্রমদ্বরা লক্ষ্য করিল বসন্তকাল সমাগত, অথচ সুনির্দিষ্ট অশোকবৃক্ষ পুষ্পহীন মৃতপ্রায়, পত্রসকল শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, বৃক্ষশাখায় নাই মধুসখের মিষ্টসুরে সঙ্গীত, নাই পক্ষীকুলের কলকাকলি।

এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আভাস দেখিয়া প্রমদ্বরার হৃদয়ে জাগিল আশঙ্কা। ভীত সন্ত্রস্ত মনে স্মরণ করিল পিতা গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর সতর্কবাণী ঃ অশোকতরু মৃতপ্রায় হইলে ফাল্গুনী পূর্ণিমা রজনীর তৃতীয় প্রহর তোমাদের পক্ষে বড়ই দুঃসময়—দুইজন যেন সে সময়ে বিচ্ছিন্ন না হও।

অবশেষে নির্দ্দিষ্ট সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রভাত ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয় বিহগের কলকাকলিতে। প্রমদ্বরার কর্ণে সেই মধুসংগীত মৃত্যু-আবাহনী গীতির মত শোনায়।

সেদিন বেশ পরিবর্তন করিয়া সে নির্মলা পূজারিণী বেশে পুষ্পকাননে প্রবেশ করিল। সঙ্গে রুরু। সে প্রমদ্বরার এই আকস্মিক গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষন্ন মুখমণ্ডল এবং তার অস্থিরতার কারণ বুঝিতে পারিল না।

প্রমদ্বরা তাহার স্বামীকে পিতার সতর্কবাণীর কথা জানায় নাই, শুধু পাশে পাশে রাখিয়াছে তাহাকে। কি সে সতর্কবাণী—পিতা বলেন নাই, কিন্তু অশোক শাখায় পুষ্পহীনতা তথা মৃত্যুপথযাত্রী বৃক্ষকে দেখিয়া স্থির প্রত্যয় হয় যে আজ তাহার নিজের জীবনেরও শেষ সময় ঘনাইয়াছে। হয়তো অলক্ষ্যে কৃষ্ণসর্প আসিয়া পুনরায় দংশন করিবে। এবারে হয়তো পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইবে না।

রাত্রি সমাগত। সারাদিন পুষ্পচয়ন করিয়া প্রমদ্বরা ফুলশয্যার সাজে গৃহাভ্যন্তর সাজাইয়াছে। বিস্মিত রুরু নানা প্রশ্ন করিলেও সে সঠিক উত্তর দেয় নাই। শুধু জানাইয়াছে—আগামী প্রভাত শুভ-প্রভাত হইলে সকল গোপন কথা এবং এই অদ্ভুত আচরণের কারণ সকলই প্রকাশ করিবে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোকধারায় ধরাতল প্লাবিত হইতেছে। গবাক্ষ পথে চন্দ্রালোক আসিয়া নিদ্রিত রুরুর সর্বদেহে পড়িতেছে। প্রমদ্বরা—নিদ্রাহীন আশঙ্কিত হৃদয়ে স্বামীর নিদ্রিত প্রশান্ত মুখের দিকে বারবার চাহিয়া দেখিতেছে।

ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল রজনীর দ্বিতীয় প্রহর। সহসা প্রমদ্বরা গবাক্ষপথে চাহিয়া দেখিল অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি আলোকোজ্জ্বল রথ নামিয়া গবাক্ষের অদূরে দাঁড়াইল। বিস্মিত বিহ্বল চিত্তে দেখিতে পাইল তাহার পিতা গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু একটি রথ হইতে নামিতেছেন। অপরটি শূন্য—সারথী আছে বটে, কিন্তু কোন যাত্রী নাই।

বিশ্বাবসু কন্যাকে আহ্বান করিলেন এবং নিদ্রিত রুরুকে জাগ্রত করিলেন। উভয়কে বলিলেন রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ুদান ও সর্পদংশনে মৃতা প্রমদ্বরার পুনর্জীবন লাভের রহস্য। আরও জানাইলেন সামান্য কয়েক পল অবশিষ্ট আছে উহাদের পরমায়ু শেষ হইবার। এজন্যেই আরও একটি দিব্যরথ প্রস্তুত আছে। উভয়ের মৃত্যু হইবে একই লগ্নে, একই ক্ষণে।

বিশ্বাবসুর কথা শুনিয়া দুই জনের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। এ মহা পুণ্যময় সহমরণ পরম বরণীয়। জীবনে মরণে ছেদ নাই, ভেদ নাই—উভয়ে চিরসাথী হইয়া থাকিবে মরণের পরেও।

বিশ্বাবসুর ইঙ্গিতে প্রমদ্বরা ও রুরু আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া শয়ন করিল। ক্ষণকাল পরে বিশ্বাবসুর রথ গন্ধর্বলোকের পথে ধাবিত হইল। তাহার পশ্চাতে দিব্যরথ দুই চিরসাথীর 'আত্মাকে লইয়া' যাত্রা করিল অমৃত-লোকের পথে।

পরদিন প্রভাতে আশ্রমবাসীগণ দেখিল উহারা দুইজনে অপরূপ ফুলসাজে নিজেদের সজ্জিত করিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া চিরনিদ্রায় শায়িত রহিয়াছে। দুইজনেরই মুখে হাসি। সে হাসি আনন্দের—সে হাসি পরিতৃপ্তির।

———

শর্মিষ্ঠা ও যযাতি

পিতা—সত্য বলুন আমার প্রতি আপনার ইহা আদেশ, না রাজদণ্ড !

কন্যা শর্মিষ্ঠার বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন দানবরাজ বৃষপর্বা,—'এ রাজদণ্ড, এ তোমার প্রাপ্য কন্যা। তুমি আমার গুরুকন্যা দেবযানীকে নির্জনস্থানের কূপে নিক্ষেপ করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিলে। ঘটনাচক্রে ভরতর্ষভ মহারাজ যযাতি ঐ স্থানে উপস্থিত না হইলে নারীহত্যার পাপে তুমি জড়িত হইতে।'

উদ্গত মনোবেদনার বেগ সংযত করিয়া বলিল দানবরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা,—'ইহার চাইতে প্রাণদণ্ড অনেক শ্রেয় ছিল পিতা। একজন দরিদ্র সামান্য বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কন্যার দাসী হইবার চাইতে প্রাণদণ্ড অনেক শ্রেয়, অনেক বরণীয় পিতা।'

আহতস্বরে বলিলেন দানবরাজ,—'তুমি ভুলিও না কন্যা দেবযানী দৈত্যদানব-গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। গুরু শুক্রাচার্যের প্রসাদে দেব-দানব সংগ্রামে আজও আমরা অজেয়। তাহারই প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে নিহত দানবকুল পুনর্জীবন লাভ করে। উপরন্তু, গুরুদেব সামান্য বৃত্তিধারী হইতে পারেন—সে তাঁহার ইচ্ছা। রাজকোষের সমগ্র ধনরত্ন চাহিলে দানবকুলের কল্যাণের জন্য আমি তাঁহাকে সব কিছু দিতে প্রস্তুত। তিনি আমাদের প্রণম্য—দানবকুলের পরম হিতৈষী বন্ধু।'

শর্মিষ্ঠা একটু থামিয়া বলিল,—'পিতা সত্য বলুন—আপনার প্রাণতুল্য একমাত্র কন্যার প্রতি আন্তরিক না নিরুপায় হইয়া এই দণ্ডাদেশ দিতেছেন ?

বৃষপর্বা চঞ্চল হইলেন,' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—'তোমার অনুমানই সত্য কন্যা--আমি নিরুপায় হইয়া এই দণ্ডাদেশ দিতেছি। দেবযানীর উপরে তোমার অমার্জনীয় ব্যবহারের জন্য শুক্রাচার্য আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। দেবযানী একটিমাত্র সর্তে অবশেষে দানবকুলকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হয়—তোমাকে তাহার দাসী হইতে হইবে।

আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল শর্মিষ্ঠা, 'ইহার কি অন্য কোন সমাধান নাই পিতা?'

'দেবযানীর উপরেই সকল নির্ভর করিতেছে। শুনিতেছি দেবযানীর সহিত মহারাজ যযাতির বিবাহ হইবে।'

অস্ফুটস্বরে বলিল শর্মিষ্ঠা,—'দেবযানী দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা হইয়াও হইবে রাজমহিষী আর আমি দানবরাজ বৃষপর্বার একমাত্র কন্যা হইয়াও হইব তাহার দাসী—চমৎকার দণ্ড, অদ্ভুত বিধিলিপি!'

ম্লানমুখে বলিলেন বৃষপর্বা,—'সত্যই অদ্ভুত বিধিলিপি। আমি সকল ঘটনাই জ্ঞাত আছি কন্যা। তুমি আমার সম্মান রক্ষার জন্য দেবযানীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে—আমার অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলে—ফলে এই বিধিলিপি। তোমার ও দেবযানীর জন্ম একই দিনে হইয়াছিল। ভাগ্যগণনা করিয়া গুরুদেব বলিয়াছিলেন যে তোমরা উভয়েই রাজমহিষী হইবে। কিন্তু দেখিতেছি যে তাহার ভবিষ্যৎ গণনা অর্দ্ধসত্য। দেবযানী হইবে রাজেন্দ্রাণী, আর তুমি হইবে তাহার দাসী!'

শর্মিষ্ঠার কর্ণে ধ্বনিত হয় দৈববাণী: তুমি হতাশ হইও না কন্যা। ভার্গবের ভবিষ্যৎ গণনা মিথ্যা হইবার নহে। বর্তমানে প্রাপ্য দণ্ড ভোগ কর। সুদিন আসিবেই, তুমিও হইবে ভাগ্যবতী রাজমহিষী।

শর্মিষ্ঠা শূন্যদৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে মেঘমালার দিকে চাহিয়া থাকে। এক খণ্ড কৃষ্ণমেঘ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এ মেঘ থাকিবে না, প্রদীপ্ত তপন আবার দেখা দিবে আলোকবিভা লইয়া। শর্মিষ্ঠার বক্ষস্থল হইতে নির্গত হয় গভীর দীর্ঘশ্বাস!

দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার ভিতরে সখিত্ব থাকিলেও আন্তরিকতা ছিল না। দেবযানীর ধারণা ছিল তাহার পিতা দানবরাজের গুরু, অতএব রাজার প্রণম্য। গুরুর কৃপালাভের জন্য দানবরাজ সর্বদা সচেষ্ট, সেই হেতু তাঁহার স্থান দানবরাজের ঊর্দ্ধে।

অন্যদিকে রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে অনুকম্পার চক্ষে দেখিত। জানিত যে তাহার পিতার প্রদত্ত বৃত্তি লইয়াই আচার্য্যের ভরণপোষণ হয়। তিনি অর্থীপ্রার্থীরূপে আছেন, তাঁহার আসন রাজার নীচে, এমন কি মানব সমাজেও 'নরানাং নৃপতি শ্রেষ্ঠ'—সুতরাং তাহার পিতা বৃষপর্বার স্থান শুক্রাচার্যের ঊর্দ্ধে।

দেবতা ও দানব উভয়কুলই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মহর্ষি কশ্যপের এক পত্নী অদিতির গর্ভজাত পুত্রগণ দেবতা এবং অপর পত্নী দনু হইতে দানবকুল ও দিতি হইতে দৈত্যকুল। দেবতাদের সহিত দৈত্য ও দানবকুলের ছিল অহিনকুল সম্বন্ধ।

প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশে জাহ্নবীর দক্ষিণ অংশ ছিল দানবদের অধিকারে—তাহার এক পার্শ্বে ছিল মহারাজ যযাতির রাজত্ব। উভয় রাজ্যের মধ্যস্থলে ছিল মৃগয়ার জন্য বিশাল অরণ্যানী—নির্মল জলপূর্ণ সরোবর। শ্বেতকমল শোভিত এই সরোবর বড়ই নয়নাভিরাম, মরাল মরালীগণ সর্বদাই ক্রীড়ারত। এই স্থানে বিহার ও জলক্রীড়ার জন্য শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানীও সখিগণসহ আসিত।

দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিতনয় কচকে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে প্রেরণ করেন এবং দেবযানীর সাহায্যে কচ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যায়। ইন্দ্রদেব জানিতেন যতদিন বৃষপর্বার সহিত শুক্রাচার্য্যের বিরোধ এবং বিচ্ছেদ না হয় ততদিন দৈত্যদানবকুল যুদ্ধে অপরাজিত থাকিবে। তাই তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করিলেন যে, এই কন্যাগত প্রাণ শুক্রাচার্য্যকে আয়ত্ব করিতে হইলে দেবযানীর সাহায্যেই করিতে হইবে। একদিন শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী শত সখিসহ অরণ্যানীর পার্শ্ববর্তী ঐ স্বচ্ছ সরোবরে জলক্রীড়া করিতে আসিয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ বস্ত্রাদি বাপীতটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া নগ্ন হইয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিল। ইন্দ্রের ইঙ্গিতে পবনদেব সহসা দমকা বাতাস দ্বারা সকলের বস্ত্র এলোমেলো করিয়া দিলেন। দেবযানীর বস্ত্র শর্মিষ্ঠার স্থানে এবং শর্মিষ্ঠার বস্ত্র দেবযানীর স্থানে পরিবর্তিত হইল। অন্যান্যদের স্তুপীকৃত বস্ত্রাদি মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল।

কুমারীগণ জল হইতে উঠিয়া স্তুপীকৃত বস্ত্রসম্ভার হইতে নিজ নিজ বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া পরিধান করিতে লাগিল। শর্মিষ্ঠা নিজ বস্ত্র যথাস্থানে আছে ভাবিয়া দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিল। অনুসন্ধানে ব্যর্থ হইয়া দেবযানী লক্ষ্য করিল তাহার বস্ত্র শর্মিষ্ঠা পরিধান করিয়াছে।

ইন্দ্রের মায়ায় দেবযানীর বিভ্রম হইল। সে তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে শর্মিষ্ঠাকে বলিল,—কোন্ সাহসে গুরুকন্যার বস্ত্র পরিধান করিয়াছ? সত্বর বস্ত্র প্রত্যর্পণ কর। তোমার পিতা আমার পিতার শিষ্য একথা ভুলিও না।

মিষ্টস্বরে স্বাভাবিক ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে কোনরূপ

বিবাদের সৃষ্টি হইত না। পিতার প্রতি অশিষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ করায় শর্মিষ্ঠা কহিল,—'দেখ দেবযানী, যখন আমার পিতা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন তখন তোমার পিতা নিম্ন কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন। তোমার পিতা অতি বিনীত ভাবে স্তুতিপাঠকের ন্যায় নিয়ত আমার পিতার স্তব করিয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি যাচ্ঞা এবং স্তবপাঠ দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন তুমি তাহার কন্যা। তুমি যতই গুরুকন্যা বলিয়া গর্ব করনা কেন, আমি কোনদিন তোমাকে আমার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করি না।'

উভয়ের কলহ উত্তরোত্তর চরমে উঠিল। শেষে দেবযানী বলপূর্বক শর্মিষ্ঠার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। দানবরাজনন্দিনী স্বভাবত বলশালিনী। সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া দেবযানীকে নিকটবর্তী একটি কূপে নিক্ষেপ করিয়া সখিগণসহ প্রস্থান করিল।

ভাগ্যক্রমে ঐ কুপ অগভীর ও জনশূন্য ছিল। কুপে নিক্ষিপ্ত হইয়া দেবযানী আর্তনাদ করিতে লাগিল।

নহুষনন্দন মহারাজ যযাতি ঘটনাচক্রে ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সরোবরের কথা তাহার বিদিত ছিল। তৃষ্ণার্ত হইয়া সরোবরের নিকটে আসিলে নারীকণ্ঠের আর্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া ঐ কূপের মধ্যে পতিত দেবযানীর দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্বক তাহাকে উত্তোলন করিতে যত্নবান হইলেন।

দেবযানীকে বস্ত্রহীনা দেখিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ নিজের উষ্ণীষ খুলিয়া উহার হস্তে দিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেবযানী তাহা পরিধান করিয়া অদূরেই একখানি মহামূল্য বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল—উহা শর্মিষ্ঠার।

নিজেকে কোনরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া দেবযানী নৃপতির সম্মুখে আসিয়া লজ্জাবনত কণ্ঠে বলিল,—আপনি কে মহাত্মন—এই বিজন অরণ্যে আমার প্রাণ ও লজ্জা রক্ষা করিলেন। আমি দৈত্যদানবগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী।

শুক্রাচার্যের কন্যাকে এইস্থানে এইরূপে দেখিয়া মহারাজ যযাতির বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

দেবযানী সলজ্জকণ্ঠে বলিল,—মহারাজ, কুপ হইতে উত্তোলন করিয়া আমার জীবন দান করিয়াছেন এবং পুরুষ হইয়া আমার নগ্নিকারূপ দেখিয়াছেন। সুতরাং এই দেহ—এই জীবন আপনার অধিকারে, আপনি আমাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করুন।

যযাতি প্রগলভা যুবতীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অবিবাহিত যুবকমাত্র, কোন যুবতীর এরূপ আত্মনিবেদনের কথা কোনদিন শ্রবণ করেন নাই।

যযাতি কহিলেন,—তোমার কথা ধর্মতঃ সত্য হইলেও তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না। তোমরা ব্রাহ্মণ, আমরা ক্ষত্রিয়—প্রতিলোম বিবাহে তোমার পিতা সম্মতি দিবেন না।'

ব্রীড়াবনতা দেবযানী কহিল,—'মহারাজ, আমি আপনাতে সমর্পিত, ধর্মে ইহার ব্যতিক্রম নাই।'

যযাতি বিচলিত হইলেন, বলিলেন,—দেবযানী তোমার মত অসামান্যা সুন্দরীকে পত্নীরূপে পাওয়া পরম সৌভাগ্য এবং আমি তোমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপের ভয়ে ভীত আমি।'

দেবযানী হাসিয়া বলিল, 'মহারাজ,—পিতা আমার কোন বাসনাকেই অপূর্ণ রাখিবেন না।'

যযাতি বলিলেন,—'এই অবস্থায় তোমার সহিত গিয়া আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হওয়া অনুচিত। তুমি তোমার পিতার নিকট যাও। তোমার অভিপ্রায় আচার্যদেব সমর্থন করিলে আমাকে জানাইবে। আমার দূত আগামী কাল অপরাহ্নে আশ্রমে তোমার সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে। জানিবে আমিও তোমাতে অনুরক্ত।'

মহারাজ যযাতির অন্তঃপুরে দেবযানী একছত্র সম্রাজ্ঞী রূপে প্রতিষ্ঠিতা হইল অতঃপর।

যোজনব্যাপী পুষ্পোদ্যানের কেন্দ্রস্থলে শ্বেতমর্মর নির্মিত যযাতির রাজপ্রাসাদ। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে পরমসুন্দর পুষ্পবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া রাজোদ্যান শোভিত করা হইয়াছে। পুষ্পবৃক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতামণ্ডপ, কুঞ্জবন, ক্ষুদ্র সরোবর ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর পরিচারক এবং পরিচারিকা নিযুক্ত ছিল। তাহাদের বসবাসের জন্য উদ্যানের বিভিন্ন প্রান্তে স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল—তাহারই একটিতে শর্মিষ্ঠার বাসস্থল নির্দিষ্ট হইল। যযাতি শর্মিষ্ঠার কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র—চক্ষে দেখেন নাই। পাছে শর্মিষ্ঠা মহারাজের দৃষ্টিপথে আসে এইজন্য দেবযানীর কৌশলে শর্মিষ্ঠার রাজভবনে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দানব রাজকন্যা অন্যান্য পরিচারিকাদের ন্যায় সামান্য বৃত্তিমাত্র পাইত। দেবযানী বিবাহের পর একবারও মহারাজের সম্মুখে শর্মিষ্ঠার নামোচ্চারণ করে নাই। ক্রমে মহারাজ শর্মিষ্ঠার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন।

নিয়তির অমোঘ বিধানে রাজকন্যা একজন ভাগ্যহীনা অখ্যাতা হইয়া উদ্যানকোণে জীবন কাটাইতে লাগিল। সে নিশীথ শয়নে একাকী মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া অদৃষ্ট চিন্তা করিত। জন্মকালে ভার্গবের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হইয়াছে ভাবিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য! এত অযত্নে, নিকৃষ্ট আহারেও তাহার ভুবনমোহিনী রূপ এতটুকু ম্লান হইল না। বরং প্রসাধনশূন্যা মলিনবেশে তাহাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিশিখার মত দীপ্তিময়ী দেখাইত। তাহার অসামান্য রূপ, দৃপ্ত ভঙ্গীমা, আচরণ সবই ছিল স্বতন্ত্র। অন্য পরিচারকেরা তাহার সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিল—কিন্তু তাহাকে পরম সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। এই রমণী সামান্যা নয় বলিয়া মনে করিত, অধিকন্তু শাপভ্রষ্টা দেবীরূপে গণ্য করিত।

এইভাবে কয়েকটি বর্ষ অতিক্রান্ত হইল।

কিন্তু বিধিলিপি অলঙ্ঘ্য। বসন্ত ঋতুর সেদিন এক ঊষাকাল। কোকিলের কুহুতানে মহারাজ যযাতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ফুলের সুবাস বহিয়া সমীরণ কক্ষকে আমোদিত করিতেছে। মহারাজ শয্যাত্যাগ করিলেন। অপর শয্যায় শিশুপুত্রকে লইয়া দেবযানী গভীরভাবে নিদ্রিতা। মহারাজ বাতায়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্র এখনও ধরাতল প্লাবিত করিতেছে। পূর্বদিকে পূর্বাচলের দিগন্তে সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে অংশুমালীর বর্ণালীর বিচ্ছুরণ। তাহার তীক্ষ্ন তেজোময় শরজাল অন্ধকারকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মহারাজ বিমনা হইলেন। বিহগের কলকাকলি প্রভাতের আগমন বার্তা ঘোষণা করিতেছে। রাজোদ্যানে অশোক-পলাশ-কিংশুক-মাধবী-বকুল-পারুলের অপরূপ সমারোহ। মহারাজের হৃদয়ে জাগে এক অপরূপের হাতছানি। প্রকৃতি যেন ডাকিয়া বলিতেছে—পুরবাসী এসো, জাগো, হৃদয় দিয়া উপভোগ কর ধরণীর এই মোহময়ী রূপ।

প্রকৃতির হাতছানিকে মহারাজ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মনে পড়িল—বাল্যকালে এই উপবনে তিনি কত আনন্দ—কত ক্রীড়া করিয়াছেন। আজ তাহার জীবন অবসরহীন। উদ্যানের পটভূমিকায় অনুভূত সেই আনন্দ এখন আর তাহার হৃদয়কে সেইরূপ বিমোহিত করে না।

মহারাজ আজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিদ্রিত মহিষী ও শিশুপুত্রের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু উহাদের জাগরিত

করিলেন না। একাকী রাজবেশ ছাড়াই কেবলমাত্র উত্তরীয় ধারণ করিয়া কক্ষ অর্গলমুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। গৃহ-রক্ষিণীরা ছুটিয়া আসিল। মহারাজ তাহাদের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি একাকী উপবনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চান, চিত্তকে করিতে চান পরিতুষ্ট—প্রফুল্ল। কোকিলের কুহুতানের সহিত নিজ অন্তরকে করিতে চান সঙ্গীতময়!

অপরূপ ফুলভারে শোভিত উদ্যানের এক একটি অংশ যেন অপরটি হইতে মনোরম। প্রকৃতির রূপে আত্মহারা মহারাজ ভ্রমণ করিতে করিতে উদ্যানের পার্শ্বস্থ পরিচারকদের আবাসস্থলের নিকটে আসিলেন। রাজোদ্যানের পরিচারকবর্গ এখনও নিদ্রামগ্ন।

মহারাজ সহসা লক্ষ্য করিলেন এক যুবতী মলিন বেশে সজ্জিত হইয়া পুষ্পমাল্য গ্রন্থনায় রত। তপ্তকাঞ্চনতুল্য তাহার গাত্রবর্ণ, ঘন কৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় কুঞ্চিত কেশরাশি—যেন মূর্তিমতী কল্যাণী ধরাতলে অবতীর্ণা। কে—এ! পরিচারিকাদের আবাসস্থলে কেমন করিয়া আসিল? মহারাজ বিস্মিত হইলেন।

ধীরে ধীরে নৃপতি রমণীর পশ্চাৎদিকের এক পুষ্পবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিলেন একটি মাল্য গ্রন্থনা সমাপ্ত এবং অপর একটির গ্রন্থনা সমাপ্তপ্রায়। নানা বর্ণের নানা পুষ্পসম্ভারে গ্রথিত এমন অপরূপ পুষ্পমাল্য যে কোন নৃপতির গলদেশে শোভিত হইবার যোগ্য। কে এ শিল্পী! কে এ ভুবনমনমোহিনী! মহারাজ যযাতি আরও লক্ষ্য করিলেন অদূরে এক লতাকুঞ্জমাঝে রাশি রাশি শুষ্ক মাল্যরাশি স্তুপাকারে সঞ্চিত রহিয়াছে। হয়তো প্রতিদিন ঊষাকালে নূতন মাল্য গ্রন্থনা শেষে যুবতী ঐস্থানে রাখিয়া দেয়। এ মাল্য রাজপুরীতে আসে না। এগুলি শুধু শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ। মনোহরণ বিলাসমাত্র!

বিস্মিত নৃপতি দেখিলেন মাল্যদ্বয় গ্রন্থনা শেষে যুবতী উহা বক্ষে চাপিয়া অঝোরধারায় ক্রন্দনে রত হইল। ঐ ক্রন্দনের অস্ফুট বিলাপ-ধ্বনির ভিতরে মহারাজ যযাতির নামোচ্চারণ শুনিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইলেন। ভাবিলেন—কে এ, কি পরিচয় এঁর?

যযাতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে মুদ্রিত-নয়না ক্রন্দনরতা যুবতীর নিকটে আসিয়া ডাকিলেন—কল্যাণি!

সেই আহ্বানে চকিত রমণী পশ্চাতে চাহিয়া মহারাজ যযাতিকে দেখিল এবং বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে বলিল—মহারাজ!

সম্মুখ হইতে সেই অসামান্য রূপবিভা দেখিয়া যযাতি বিমুগ্ধ

হইলেন। যুবতীর পরিধানে সামান্য বস্ত্র—সজ্জাশূন্য, নাই কজ্জল-শোভিত নয়ন, লোধ্ররেণু শোভিত মুখারবিন্দ—নাই কেয়ূর কঙ্কন। দুই চক্ষের অশ্রুধারা কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে। এ যেন সৌন্দর্যের মূর্তিমতী এক অপরূপ বিষাদপ্রতিমা।

মহারাজ কহিলেন,—হ্যাঁ, আমি মহারাজ যযাতি। কিন্তু কে তুমি এই উদ্যানপ্রান্তে পরিচারকদের আবাসস্থলে? তুমি তো সামান্যা নও।

'আমি শর্মিষ্ঠা—মহারাণী দেবযানীর দাসী।'

বিদ্যুৎচমকের মত অতীত কথার স্মরণ হইল মহারাজের। আর্তস্বরে কহিলেন তিনি,—দানবরাজ বৃষপর্বাতনয়া রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা!

'হ্যাঁ মহারাজ, আমিই সেই হতভাগিনী।'

বিমূঢ় কণ্ঠে বলিলেন মহারাজ,—রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই গ্লানিকর স্থানে তোমার বসবাসের হেতু কি? মহিষী দেবযানীর শত শত দাসী আছে, তাহারা প্রাসাদে সুখে বাস করে—কিন্তু তুমি এই উদ্যান-পরিচারকদের আবাসস্থলে কেন?

মৃদু মলিন হাসিয়া শর্মিষ্ঠা বলিল,—'এর উত্তর আপনার মহিষী দেবযানীই দিতে পারে, আমি নই।'

বুঝেছি,—নিম্নস্বরে বলিলেন মহারাজ,—এক বর্ষকালের অধিক আমাদের বিবাহ হইয়াছে, একদিনও দেবযানী তোমার নাম উচ্চারণ করে নাই, তোমাকে রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশেরও অনুমতি দেয় নাই পাছে তুমি দৃষ্টিপথে পতিত হও। উদ্যান পরিচারকদের গৃহে গ্লানিকর ভাবে তোমাকে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে। অতঃপর ধীরে ধীরে বিস্মৃতি আমাকে গ্রাস করিয়াছে!

নারীজাতির এই হিংস্র বিজিগীষা দেখিয়া শিহরিত হইলেন মহারাজ যযাতি। ক্ষণিক পরে কহিলেন,—আমাকে ক্ষমা কর রাজনন্দিনী—আমি শুনিয়াছিলাম—তুমি দাসী হইয়া আসিবে, তাহার পর আর সন্ধান লই নাই। যাহা হউক এই পরমসুন্দর মাল্যদুইটি কাহার জন্য রচনা করিয়াছ। এগুলি কোন্ ভাগ্যবানের গলে শোভা পাইবে?

শর্মিষ্ঠা বলিল,—এই মাল্য রচনা আপনারই উদ্দেশে মহারাজ। প্রতিদিন ঊষাকালে সকলের অজ্ঞাতে মাল্য রচনা করি—যদি কোনদিন আপনি এখানে উপস্থিত হন সেই আশায়। কিন্তু সমগ্র দিন অনাদৃত থাকিয়া পরদিন প্রভাতে যখন এগুলির রূপ-রস-গন্ধ শুখাইয়া যায় তখন নূতন মাল্য রচনা করি।

বিস্মিত নৃপতি বলিলেন,—আমার জন্য!

নৃপতিকে প্রণাম করিয়া শর্মিষ্ঠা আবেগভরে কহিল,—'আমি জানিতাম যে একদিন আপনি আসিবেন। সেই শুভলগ্ন যাহাতে বিফলে না যায় সেইজন্য প্রতিদিনই মাল্য রচনা করিতেছি—আজ এ বরমাল্য আপনার গলায় পরাইয়া আমি স্বয়ংবরা হইব, আপনিও অপর মালাটি আমার গললগ্ন করিয়া গন্ধর্বমতে আমাকে বিবাহ করুন।'

বলিতে বলিতে ক্ষণমাত্র অবসর না দিয়া শর্মিষ্ঠা মহারাজ যযাতির গলায় একগাছি মালা পরাইয়া দিয়া বলিল,—'মহারাজ অপর মালাখানি আমার গলায় পরাইয়া দিন। বিবাহ হইবামাত্র আমি হইব রাজপত্নী, আপনা হইতেই হইবে আমার দাসীত্বের মোচন—মহারাজ প্রগল্ভাকে ক্ষমা করুন।'

উদ্গত ক্রন্দনে শর্মিষ্ঠা নৃপতির পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

যযাতি পরম আদরে শর্মিষ্ঠাকে উত্তোলন করিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—'আজ তোমার দুঃখের রজনীর অবসান। আমার রাজ্যে আমার রাজোদ্যানে এত বড় অবিচার এতদিন চলিতেছিল তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।'

বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া যযাতির বক্ষলগ্ন হইল রাজমহিষী শর্মিষ্ঠা।

সহসা যযাতির হর্ষোৎফুল্ল মুখে ফুটিয়া উঠে বিষণ্ণতা, কপালে দেখা যায় চিন্তার রেখা।

শর্মিষ্ঠা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'আর্য্যপুত্র! আপনি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়াছেন। আমি জানি দেবযানীর বিবাহকালে দেবযানীর প্ররোচনায় শুক্রাচার্য্য আমাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—যাহাতে কোনদিন দাসীত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত না হই। আমি প্রতি রজনীতে আপনার স্বপ্ন দেখিতাম আর দেখিতাম দুঃসহ হিংসাপূর্ণ এক রমণীর মুখ—সেখানে প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, আছে শুধু আত্মসর্বস্ব সুখের সন্ধান। আমি জানি দেবযানীর চরিত্র। এই বিবাহের সংবাদে সে এত উত্তেজিত হইবে যে স্বামীর ঘোর অমঙ্গল জানিয়াও শুক্রাচার্য্যকে দিয়া অভিশপ্ত করাইবে নিজ স্বামীকে—শুধু আমার দাসীত্ব মোচনের জন্য পানিগ্রহণের অপরাধে। মহারাজ! আমি সত্যনিষ্ঠ—জীবনে কোন কালিমা আমাকে স্পর্শ করে নাই। সতীত্ব তেজ, পতিব্রতার পবিত্র কর্তব্যের নিষ্ঠার ফলে হইবে আমার পুণ্য সঞ্চয়। আমি কথা দিতেছি—যদি আপনি অভিশপ্ত হন তবে আমি এবং আমার ভাবী সন্তান আপনাকে শাপমুক্ত করিব। আপাততঃ এ বিবাহ গোপন থাকুক, যাচিয়া অমঙ্গল আহ্বান করিবার প্রয়োজন নাই।

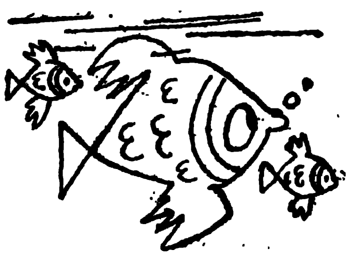
বিহ্বলস্বরে যযাতি বলিলেন,—'গোপন থাকিবে কিরূপে! আমার মহিষী দাসীত্বের জীবন কাটাইবে—ইহা অসম্ভব। রাজমহিষী হইয়া তাহার দাস্যভাব অচিন্ত্যনীয়।'

মৃদু হাসিয়া শর্মিষ্ঠা বলিল,—'মহারাজ! আপনিই আমার আনন্দ, আমার প্রীতি, আমার সম্পদ। পার্থিব কোন কিছুতে আমার প্রয়োজন নাই, শুধু এই স্থান হইতে পরিচারক-পরিচারিকাদের অন্যত্র প্রেরণ করিয়া এই অংশ নির্জন করুন। যদি কোন একান্ত বিশ্বস্ত দাসী থাকে তবে তাহাকে আমার নিকটে রাখিবেন, কারণ স্থানটি নির্জন হইবে, খাদ্য ও বিভিন্ন প্রয়োজনে বাহিরের সংযোগ প্রয়োজন, সেই কাজ ঐ দাসীর দ্বারাই হইবে। আর কিছু আমার প্রয়োজন নাই—প্রভাতে বা দিনান্তে একবার দর্শন দিবেন, নিত্যনূতন মাল্য আপনার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।'

স্তম্ভিত হইলেন মহারাজ যযাতি। বলিলেন,—'স্বামীর কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছায় রাজরাণী পরিচারিকারূপে আত্মগোপন করিয়া থাকিবে, আর অপর এক মহিষী—! থাক্ সে কথা, তোমাকে তৃপ্ত ও সুখী করাই আমার ব্রত, যদি প্রতিদিন সামান্য সান্নিধ্যলাভে তৃপ্ত হও তবে তাহাই হইবে কল্যাণি।'

শর্মিষ্ঠা নৃপতির পদতলে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—'আমি ভাগ্যবতী স্বামিন্।'

———



লোপামুদ্রা ও অগস্ত্য

রাজসুতা লোপামুদ্রা।

বিদর্ভরাজের প্রথমা কন্যা সে। তাই চির আদরিনী, অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী—পিতামাতার নয়নমণি। সে নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে মহারাণীর মনে জাগিল তাহার বিবাহ চিন্তা—কন্যার কেমন ভাগ্য, জামাতা কিরূপ হইবে ইত্যাদি।

তিনি নিজে স্বয়ংবর সভায় বিদর্ভ রাজকুমারকে বরণ করিয়াছিলেন। আজ তাহার স্বামী রাজা, তিনি রাণী—চিরসুখী। তাহার মনে হয় স্বয়ংবরই শ্রেষ্ঠ বিবাহ, তবে বীর্য্যশুল্কা না স্বেচ্ছানির্বাচন, কোন্‌টা বেশী মনোগ্রাহী—মহারাণী মনে মনে বিচার করেন।

বীর্য্যশুল্কা সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সে ক্ষেত্রে কন্যার কোন স্বাধীনতা নাই। ত্রেতা যুগে জনকদুহিতা সীতা বীর্য্যশুল্কা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাপতি হইয়াছিলেন।

একদিন মহারাণী তাহাদের কুলগুরুকে আহ্বান করিয়া লোপামুদ্রার জন্মপত্রিকা রচনা করিতে বলিলেন—বিশেষ করিয়া কন্যার বিবাহফল জানিবার ইচ্ছায়। বিবাহ কবে হইবে এবং পতিপ্রিয়া, সন্তানবতী, সুখী হইবে কিনা।

সপ্তাহকাল পরে কুলগুরু আসিয়া ম্লানমুখে রাজমহিষীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

উদ্বিগ্ন চিত্তে রাজমহিষী তাঁহাকে গণনার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন,—কন্যার হইবে উচ্চবর্ণে অনুলোম বিবাহ, কোন রাজ-অধিরাজ রাজপুত্র কন্যার স্বামী হইবে না। একজন দরিদ্র মহাতপা ঋষির সহিত বিবাহের লক্ষণ গণনায় পাইতেছি—ঈশ্বর করুন আমার গণনা যেন ভ্রান্ত হয়।

ইহা শুনিয়া রাজমহিষী স্তম্ভিত বিষণ্ন হইলেন। অনন্ত প্রাচুর্য্যের মধ্যে যে কন্যা লালিত পালিত, তাহার জীবনে এই অভিশাপ কেন? তিনি শুনিয়াছিলেন বৃদ্ধ মহর্ষি চ্যবন তপঃপ্রভাবে রাজা শর্য্যাতিকে

বিপন্ন করিয়া রাজকন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ কোন মহাতেজা বৃদ্ধ মহর্ষি হয়তো লোপামুদ্রার পতি হইবে। বৃদ্ধ স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু সখা-বন্ধু-দয়িত ভাবা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহার সহিত হয়ত যুক্ত হইবে অকালবৈধব্য অথবা সহমরণ।

বিদর্ভরাজকে বলেন কন্যার এই দারুণ ভাগ্যলিপির কথা। রাজা হন চিন্তিত। শান্তি স্বস্ত্যয়ন যজ্ঞ—সকল কিছুই করিতে হইবে ভাবেন। কিন্তু ভবিতব্যকে প্রতিরোধ করা সম্ভব কি?

ক্রমে সমগ্র রাজপুরীতে এ নিদারুণ ভাগ্যগণনার কথা ছড়াইয়া পড়িল। শুনিতে পাইল বালিকা লোপামুদ্রাও।

আশ্চর্য্য! বালিকার মনে জাগিল এক অদ্ভুত আনন্দ। সে মহর্ষিদের অসীম ক্ষমতার কথা শুনিতে ভালবাসিত। কোন মহর্ষি কাহাকেও বরদান করিয়া অসীম ঐশ্বর্য্যশালী করেন, আবার কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া ভস্ম করেন। মহর্ষি উতথ্য তপোবলে সমুদ্র শোষণ করেন, মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতৃহরণকারী পুলোমা রাক্ষসকে দৃষ্টি দ্বারাই ভস্ম করেন। ইত্যাদি নানারূপ অলৌকিক অদ্ভুত কাহিনী সে শুনিতে ভালবাসিত এবং মহর্ষিদের গভীর শ্রদ্ধা করিত।

কোনো মহাতপা মহর্ষি তাহার স্বামী হইবে—এইরূপ ভাগ্যলিপি শুনিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য সে সম্বন্ধে বালিকার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কোন ধারণাই ছিল না।

ধীরে ধীরে লোপামুদ্রা যৌবনে পদার্পণ করিল। বিদর্ভরাজ তাহার বিবাহের কথা চিন্তা করিতেছেন। ভাগ্যগণনাতে যাহাই থাকুক না কেন, দৈবকে সম্বল করিয়া পুরুষকারকে অস্বীকার করা উচিত হইবে না ভাবিয়া বিদর্ভরাজ বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্রদের সহিত লোপামুদ্রার বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন তিনি স্বয়ংবর সভা করিয়া বিভিন্ন দেশের রাজা, অধিরাজ, রাজকুমারদের আমন্ত্রণ করিবেন মনস্থ করিলেন।

স্বয়ংবর সভার উদ্যোগ করা সহজে সম্ভব নহে। আমন্ত্রিতদের জন্য সুরম্য অতিথিশালা নির্মাণ, দাসদাসীর ব্যবস্থা করা এবং নানা উপাচার সংগ্রহ করিতে সময় আবশ্যক। বিদর্ভরাজ তথাপি সম্পূর্ণ আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এইকালে অগস্ত্য হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী কঠোর তপস্যায় ব্রত ছিলেন। তপস্যা অন্তে সিদ্ধিলাভের পর তিনি পরমপিতা কর্তৃক মহর্ষি আখ্যা লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে তাহার উপর কয়েকটি দুরূহ কর্ম নির্দিষ্ট করা হইল। দ্বাপর যুগে মহারাজ নহুষ স্বীয় তপস্যাবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া ক্রমে অত্যাচারী ও অহমিকাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। পরাজিত বাসবপত্নী শচীকে তিনি লাভ করিতে উৎসুক। সেই নহুষকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ধরাতলে পতনের দায়ীত্ব তাহাকে লইতে হইবে।...জলদৈত্যগণ পৃথিবীর মানবদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার করিতেছে—দেবগণ জলতলে লুক্কায়িত দৈত্যগণকে বধ করিতে অক্ষম হইয়াছেন—সমুদ্র শোষণ করিয়া উহাদের লুক্কাইত স্থানকে দৃশ্যমান করিতে হইবে।......সর্বোপরি জীবন সায়াহ্নে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইবে বিন্ধপর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণখণ্ডে আর্য্যধর্ম প্রচার করা।

এখন তাহার প্রথম কর্তব্য ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা শেষে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করা। নতুবা পিতৃকুল জলপিণ্ড না পাইয়া নরকে পতিত হইবেন—সন্তান হইবে বংশধারার বাহক এবং রক্ষক।

কিন্তু কোথায় তাহার বিবাহের কন্যা? তিনি অখ্যাত দরিদ্র সর্ব্বহারা। এমতাবস্থায় কে তাহাকে দান করিবে সুলক্ষণা কন্যা? কোথায় পাইবেন তাহার ভাবী অনুরাগিনী সহধর্মিনী তাহা জানিবার জন্য যোগাসনে বসেন। তাহার দিব্যদৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে একখানি হাস্যময়ী মুখ। কে এ! বিস্মিত মুগ্ধ হন মহর্ষি অগস্ত্য। এ যে অপরূপা সুন্দরী ষোড়শী বালা! কজ্জল শোভিত নয়ন এবং লোধ্ররেণু শোভিত হাস্যমধুর মুখমণ্ডল। দিব্যালঙ্কারে ভূষিত দেহ, পরিধানে মহামূল্য বস্ত্র। মহর্ষি ধ্যানে কন্যার সমগ্র পরিচয় এবং পরিস্থিতি উপলব্ধি করেন। তাহার পর দ্রুত পদচারণা করেন বিদর্ভ রাজধানী অভিমুখে।

বিদর্ভরাজ সিংহাসনে আসীন। কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন সম্পূর্ণ। বিভিন্ন রাজঅধিরাজ রাজকুমারদের আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন মহারাজা, এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য 'জয়স্তু মহারাজ' বলিয়া রাজসিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আত্মপরিচয় দিলেন—আমি মহর্ষি অগস্ত্য।

অল্পবয়স্ক জ্যোতিষ্মান মহর্ষিকে দেখিয়া মহারাজ শশব্যস্তে তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। মহর্ষি মৃদুহাস্যে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ মহর্ষি অগস্ত্যের নাম ইতিপূর্বে শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু আগন্তুকের দীপ্ত দিব্যকান্তি দেখিয়া অনুমান করিলেন এই নবীন যুবক কোন মহাতপা ঋষি হইবেন।

মহর্ষি বলিলেন,—আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন তবেই আমি তাহা জ্ঞাপন করিব।

মহারাজ সবিনয়ে প্রতিশ্রুতি দান করিলে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অগস্ত্য বলিলেন,—মহারাজ! আমি অবিবাহিত—ব্রহ্মচর্য তপস্যাব্রত পালনের পরে এখন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে চাই। আমি আপনার কন্যা লোপামুদ্রার পানিপ্রার্থী।

স্তম্ভিত হইলেন বিদর্ভরাজ—স্তম্ভিত হইলেন সভাসদবর্গও।

বিহ্বলচিত্তে বিদর্ভরাজ বলিলেন,—মুনিবর! আপনি অপেক্ষা করুন—লোপামুদ্রা আর বালিকা নহে—তাহার অভিমত জানিতে হইবে। যদি তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে তাহা হইলে আমি এ প্রস্তাবে অক্ষম। এমনকি যদি সত্যভ্রষ্ঠ বা অভিশপ্ত হই, তবুও না।

স্মিতহাস্যে বলিলেন মহর্ষি,—আপনার বলিবার পূর্বেই আমি ইহা চিন্তা করিয়াছি—আমি মহর্ষি চ্যবন নহি। আপনার কন্যার বিন্দুমাত্র অসম্মতি থাকিলে আমি হাসিমুখে ফিরিয়া যাইব। নিজেকে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া কুণ্ঠিত হইব না।

রাজ-অন্তঃপুরে মহর্ষি প্রস্তাবিত বিবাহের বার্তা পৌঁছিয়াছে। শুনিয়াছে লোপামুদ্রা। সে ত্বরিতপদে আসিয়া রাজসভার পশ্চাতে অন্তঃপুরচারিনীদের জন্য নির্মিত গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল এবং একান্তে পিতাকে বলিল,—ইঁহাকেই আমি প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দর্শন করি—ইনিই আমার ভাবী পতি। আমার সানন্দ সম্মতি আছে এই পরিণয়ে। ইঁহাকে পতিরূপে পাইলে দারিদ্র্য কৃচ্ছসাধনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিব। আমার জীবন ধন্য হইবে।

কন্যার সম্মতি জানিয়া আনন্দিত মহর্ষি বলিলেন,—আমি ধন্য। তপস্যাস্থল হইতে প্রথমেই আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমাকে কিঞ্চিৎ স্বর্ণমুদ্রা দান করুন। ঐ অর্থে ঋষিদের তপোবনে আশ্রমগৃহ নির্মাণ করিয়া যথাকালে প্রত্যাগমণ করিব। ইতিমধ্যে আপনি বিবাহের আয়োজন করুন।

বিবাহ সমাধা হইল উৎসবহীন এক সন্ধ্যায়। নিরানন্দ বিষণ্ণ রাজপুরীতে উৎসাহহীন আচার অনুষ্ঠান অপূর্ণ রহিল না। বিদায়-কালে বিদর্ভরাজ কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য দাসদাসী এবং ধনরত্ন দিতে চাহিলেন।

মহর্ষি অগস্ত্য সবই প্রত্যাখ্যান করিয়া কয়েকটি সবৎসা গাভী এবং সামান্য স্বর্ণমুদ্রা মাত্র গ্রহণ করিলেন। বলিলেন,—ঐশ্বর্য্য তপশ্চারণ এবং অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটায়। আমার আশ্রয়ে আপনার কন্যাকে সুখী করিবার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করিব। একজন শূদ্রা পরিচারিকা এবং একজন গোপালক নিযুক্ত করিয়াছি, তাহারাই সংসারে সাহায্য করিবে। আমার জন্য অন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই।

আশ্রমে আসিয়া চমকিত হইল রাজকুমারী লোপামুদ্রা। দেখিল ক্ষুদ্র স্বল্প পরিসর দুই কক্ষযুক্ত এক পর্ণকুটির। গো-পশ্বাদি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুটিরের অদূরে বংশ নির্মিত অবরোধের বেড়া নির্মিত হইয়াছে। সে শুনিয়াছিল—সামান্য দূরে রন্ধনশালা।

ঋষিদের তপোবন ফলপুষ্পভারে শোভিত থাকে, সেখানে চক্রবাক চক্রবাকী ও হরিণেরা নির্ভয়ে বিচরণ করে, নিকটেই থাকে কুসুমিত পদ্ম-সরোবর। কিন্তু এখানে কিছুই নাই। কল্পনার সহিত বাস্তবের অমিল দেখিয়া রূঢ় আঘাতে তাহার হৃদয়ে জাগিল গভীর হতাশা। ঋষিবালাগণ রাজকন্যা দেখিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু লোপামুদ্রার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া ত্বরায় স্থানত্যাগ করিল।

মহর্ষি গৃহে পৌঁছাইয়া গোধনকে গোপালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া লোকালয়ে গিয়াছেন। সেই স্থান হইতে তণ্ডুল, ঘৃত, তৈল, গোধূম, অরণিকাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিবেন। গৃহে ঋষিবালাগণ নানাজাতীয় ফলমূল পুষ্পসম্ভার উপহার দিয়া গিয়াছে। লোপামুদ্রা অন্যত্র দেখিয়াছে বিবাহে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার হীরকখচিত কনকমাল্য, ললন্তিকা, নানা আভরণ, দেখিয়াছে নানাবিধ বস্ত্রসম্ভার, দুগ্ধজাত নানা উৎকৃষ্ট রসনাসিক্তকর খাদ্যাদি। সেইক্ষেত্রে দরিদ্র ঋষিবালাদের প্রদত্ত এই উপহার! নিজের দরিদ্র অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া লোপামুদ্রা শিহরিত হইল।

ক্রমে সূর্যদেব পশ্চিমে অস্তাচলমুখী হইলেন। নানা বর্ণালীর রূপশোভায় পশ্চিমাকাশ শোভিত হইল। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি করিয়া মহিলাগণ সন্ধ্যাবন্দনার সময় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। লোপামুদ্রা ধীরে ধীরে নবনির্মিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শূদ্রা-

পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়াছে। শয্যা দেখিয়া লোপামুদ্রা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইল। কক্ষের একপার্শ্বে ভূমিতে তৃণগুচ্ছ পাতিয়া তাহার উপর সামান্য বস্ত্রের আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে। উপাধান বলিতে শাল্মলী তন্তুর নির্মিত দুইটি ক্ষুদ্র পদার্থবিশেষ। গৃহকোণে রাখা হইয়াছে মৃত্তিকা নির্মিত দীপাধার। এখন তৈলশূন্য—ঋষি তৈল লইয়া ফিরিলে এই দীপ জ্বলিবে। পরিচারিকা নানাপ্রকার বন্যপুষ্পের মাল্য দ্বারা সযত্নে প্রথম শয্যা রচনা করিয়াছে। এই সব দেখিয়া লোপামুদ্রার চক্ষে অশ্রুধারা নামিল।

রাজকন্যার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল তাহার মাতার অপূর্বসুন্দর উজ্জ্বল রত্নখচিত শয্যা। শয়নগৃহ নানা নয়নাভিরাম উপাচারে সজ্জিত থাকিত। ছিল পুষ্পগন্ধ পরিপূর্ণ মনোমুগ্ধকর মায়াময় পরিবেশ। চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রদীপে ঘৃতের দীপশিখা জ্বলিত। সুবেশা কিংকরীরা গ্রীষ্মতাপক্লিষ্ট কক্ষে বীজন করিত।

ঐশ্বর্য্য সুখ বৈভবের সঙ্গে দারিদ্র্যের যে দুস্তর ব্যবধান তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিদারুণ মানসিক ক্লিষ্টতা লোপামুদ্রাকে আবিষ্ট করিল। আজ তাহার জীবনে প্রথম নিভৃত স্বামীসম্ভাষণ করিতে হইবে। তাহার পরিবেশ দেখিয়া হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা নামিল লোপামুদ্রার।

একজন শূদ্রের স্কন্ধে সাংসারিক দ্রব্যভার লইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে মহর্ষি ফিরিলেন। কুটিরে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অগস্ত্য কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া সান্ধ্যাহ্নিকে বসিলেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া লোপামুদ্রা অপটু হস্তে বীজন করিতে লাগিল।

সান্ধ্যাহ্নিক সমাপ্ত হইলে হাস্যমুখে অগস্ত্য রাজকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত তাহার সুগঠন মুখমণ্ডল বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন—যেন মূর্তিমতী বিষাদ প্রতিমা। দুইচক্ষে যেন অশ্রুর আভাস।

মহর্ষি অগস্ত্য বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—বল প্রিয়ে! তোমার ক্রন্দনের কারণ কি? পিতমাতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া নিশ্চয় মনোবেদনায় কাতর হইয়াছ, নতুবা নারীচরিত্রে অনভিজ্ঞ আমি হয়তো তোমার মনে অজ্ঞাতে কোন আঘাত দিয়াছি। বল—বল প্রিয়ে, কেন এই বিষণ্ণতা। যদি আমার সাধ্যে থাকে—আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি—নিশ্চয় তোমার মনোবেদনা দূর করিব।

ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল লোপামুদ্রা। বলিল,—এই কি আমার

পুষ্পশয্যা ! জীবনের প্রথম স্বামী সহবাসের এই কি পরিবেশ ও আয়োজন। এই তৃণশয্যা আমি চাহিনা। আমি দেখিয়াছি আমার মাতার শয়নকক্ষ—রত্নসম্ভার খচিত সুকোমল ও অপরূপ সে শয্যা। আমি আর কিছু চাহিব না প্রভু—শুধু আমার জীবনের প্রথম রাত্রির শয্যা যেন রাজপুরীর চাইতেও মহার্ঘ ও সুন্দর হয়, সমারোহ যেন হয় অতুলনীয়। আপনি মহাতপা মহর্ষি। ইচ্ছা করিলে তপঃপ্রভাবে আমার সামান্য মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন।

স্তব্ধ হইলেন মহর্ষি। নারীজাতির জন্মগত মানসিকতা, আবেগ, বিলাস-কল্পনা—সবই অজ্ঞাত ছিল তাহার। ধীরকণ্ঠে বলিলেন তিনি,—তোমার পিতা দানস্বরূপ আমাকে অতুল ধনসম্পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। ঐশ্বর্যের বিলাস তপশ্চারণ ও অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটায়, তাই কোন কিছু গ্রহণ করি নাই। এখন পুনরায় ঐ সকল প্রার্থনা করা অবমাননাকর। আমায় ক্ষমা কর কল্যাণী—ক্ষণিক চিন্তা করিতে দাও।

তথাপি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল রাজবালা,—তপঃপ্রভাবে আপনার পক্ষে কি এই সামান্য ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি অসম্ভব ? শুনিয়াছি মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইক্ষাকু কুলতিলক মহারাজ নহুষের জন্য দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ধীরকণ্ঠে অগস্ত্য পুনরায় বলিলেন,—তপঃপ্রভাবে তোমার সামান্য প্রার্থনা পূর্ণ করা সম্ভব, কিন্তু ঋষিরা পার্থিব ভোগবিলাসের জন্য তপোবলে কোন কিছুই প্রতিগ্রহ করেন না। তাহাতে শক্তিনাশ এবং পুণ্যক্ষয় হয়। তুমি এই গৃহে নিরাপদে অবস্থান কর, আমি যাইতেছি—কোন কিছু প্রতিগ্রহ না করিয়া নিশ্চয় তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। আজ অমানিশা, পক্ষকাল পরে প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমার রাকা তিথিতে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।

গভীর অমা-অন্ধকারে অভুক্ত ক্লান্তদেহে বাহির হইলেন মহর্ষি অগস্ত্য। আকাশের ম্লান নক্ষত্রালোকে পথচলা যদিও দুস্কর, তবুও তিনি কোন বাধাই মানিলেন না—অথচ কোথায় যাইবেন স্থির নাই। শুধু তাহার এক চিন্তা—লোপামুদ্রাকে সুখী করিতে হইবে। প্রথম দিব্যদৃষ্টিতে তিনি হাস্যময়ী অপরূপা রাজবালাকে দেখিয়াছিলেন—সেই চিত্র তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই চিত্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা এখন একমাত্র কর্তব্য। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে অগস্ত্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ওদিকে লোপামুদ্রা উদাস দৃষ্টিতে মহর্ষির গমন পথের দিকে চাহিয়া

রহিল। তাঁহাকে ফিরিবার জন্য কোন অনুরোধ অথবা মিনতি করিল না। ক্রমশঃ চক্ষুর অন্তরাল হইলে গভীর হতাশায় তৃণশয্যায় লুটাইয়া পড়িল। আকুলিত অশ্রুধারায় তাহার উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

মহর্ষি অগস্ত্য ত্রস দস্যু, শতর্ব্বা এবং ব্রধ্নশ্ব—এই তিনজন রাজার নিকটে প্রথমে গেলেন ধনপ্রাপ্তির আশায়। কিন্তু উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষে তিনজনের ধনভাণ্ডারই শূন্য। অর্থ চাহিলে রাজা ও প্রজাদের ক্লেশ হইতে পারে বুঝিয়া ঐ সকল রাজ্য ত্যাগ করিলেন—কিছু প্রার্থনা করিলেন না। শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

পূর্ণিমার রাকা তিথির আর মাত্র চারিদিন অবশিষ্ট। অতঃপর তিনি দ্রুত পদচালনা করিলেন দানবরাজ ইল্বলের রাজধানী অভিমুখে। তিনি জানিতেন দানবরাজ পৃথিবীর ভিতরে সর্বাপেক্ষা ধনী। তাহার ধনভাণ্ডার কুবেরের তুল্য। লক্ষ লক্ষ হীরা, মণিমানিক্য ও স্বর্ণমুদ্রায় তাহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ। সেখানে প্রার্থনা করিলে নিশ্চিত সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

দূরে দানবরাজের প্রাসাদ দেখা দিল। মহর্ষি ঐ প্রাসাদের দিকে দ্রুত পদচালনা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন শূদ্র আসিয়া তাহার পথরোধ করিল। অবলুণ্ঠিত হইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া শূদ্র বলিল,—প্রভু! আপনি কোথায় যাইতেছেন—দানবরাজ মায়াবী এবং প্রবল দ্বিজদ্বেষী। ব্রাহ্মণ দেখিলেই তিনি মায়াবলে তাহাদের হত্যা করেন। লক্ষ্য করিয়া দেখুন—এই দানবপুরে একজনও ব্রাহ্মণ নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছেন।

বিস্মিত হইলেন অগস্ত্য। ভুলিয়া গেলেন লোপামুদ্রাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল কঠোর এক সংকল্পের প্রতিচ্ছবি। ব্রহ্মহত্যাকারীকে শাস্তিদান করা প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। দ্রুতপদে দানবপুরীর দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন তিনি।

দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখিয়া শশব্যস্তে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিছুদিন ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রহ্মহত্যা সম্ভব হয় নাই। আজ মহর্ষিকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া ইল্বল কপট বিনয়ে তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে অগস্ত্য তাঁহার মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন।

ইল্বল বলিল,—মুনিবর, শ্বেত অশ্ববাহিত সুবর্ণময় রথসহ হস্তী-

পৃষ্ঠে যত ধনরত্ন লইয়া যাইতে চাহেন সবই আপনাকে দান করিয়া পুণ্য অর্জন করিব। অগ্রে আপনি স্নান পূজা সমাপন করিয়া তৃপ্তি সহকারে আহার্য গ্রহণ করুন, তাহার পরে দান গ্রহণ করিবেন।

অগস্ত্য লক্ষ্য করিলেন এই কথা বলিবার সময় ইল্বলের মুখমণ্ডলে ক্রূর হাস্য। তপোবলে তৎক্ষণাৎ ইল্বলের গোপন উদ্দেশ্য ও কর্মধারা বুঝিলেন এবং মনোভাব গোপন করিয়া স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া আহারে বসিলেন।

তাঁহার ভোজনপাত্রে রহিয়াছে সুগন্ধযুক্ত উপাদেয় প্রচুর ভেড়ার মাংস। একটি ক্ষুদ্র ভেড়ার সম্পূর্ণ মাংসই রন্ধন করিয়া তাহাকে ভোজনার্থে দেওয়া হইয়াছে। মহর্ষি ঐ সম্পূর্ণ মাংস তৃপ্তি সহকারে আহার করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে দানবরাজ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপিকে মায়াবলে ক্ষুদ্র ভেড়ায় পরিণত করিয়া অগস্ত্যকে আহার করিতে দিয়াছিল। আহার সমাপ্ত হইলেই মায়াবলে উদরস্থ ভেড়াটিকে বাতাপিতে রূপান্তরিত করিবে এবং সে উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবে। ইহা এত দ্রুত সমাপ্ত হইবে যে যতই মহাতপা ঋষি হউন না কেন, অভিশাপ দিবার অথবা আত্মরক্ষার কোন অবসরই পাইবেন না। এইভাবে সে এতদিন ব্রহ্মহত্যা করিত।

মহর্ষির আহার সমাপ্ত দেখিয়া উৎফুল্ল দানবরাজ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাতাপিকে উদর দীর্ণ করিয়া বাহির হইবার আহ্বান করিতে লাগিল।

অগস্ত্য হাসিয়া কহিলেন,—বৃথা চেষ্টা দানবরাজ। আমি তপোবলে তাহাকে জীর্ণ করিয়া পঞ্চভূতে লীন করিয়াছি। তোমার মন্ত্রের সাধ্য নাই আমার তপোবলকে অতিক্রম করে।

ইল্বল শিহরিত হইল। ইনি প্রকৃতপক্ষে অমিততেজা মহর্ষি—অভিশপ্ত হইবার আশংকায় অগস্ত্যের পদতলে বার বার মার্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

অগস্ত্য প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—তুমি আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলে। এক্ষণে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে জীবনে আর ব্রহ্মহত্যা করিবে না এবং আমাকে তোমার প্রতিশ্রুত সুবর্ণ রথ সহ হস্তীপৃষ্ঠে ঈপ্সিত ধনরত্ন দান করিতে হইবে।

অভিশাপের ভয়ে ভীত ইল্বল তাহার অঙ্গীকার মত প্রার্থিত সকল প্রকার ধনরত্ন শ্বেতবাহনসহ সুবর্ণ রথ দান করিল এবং ব্রহ্মহত্যা করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

পক্ষকাল প্রায় অতীত হইয়াছে। লোপামুদ্রা প্রতি রাত্রে উদিত চন্দ্রের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে। অবিলম্বে আসিবে প্রতিশ্রুত রাকা পূর্ণিমা, কিন্তু কোথায় মহর্ষি! গৃহত্যাগের পরে তাঁহার কোন সংবাদই কেহ পায় নাই। আশ্রমবাসীরাও চিন্তিত হইয়াছে।

সহসা প্রভাতে দেখিল এক অপরূপ কারুকার্য্য শোভিত সুবর্ণময় রথ আশ্রমের দিকে আসিতেছে। চারিটি শ্বেত অশ্ববাহিত সে রথ। তাহার পশ্চাতে সারিবদ্ধ হস্তীপৃষ্ঠে নানা দ্রব্যসম্ভার। লোপামুদ্রার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আশ্রমবাসীগণও বিস্মিত নয়নে ঐ অগ্রসরমান শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল। এই দীনদরিদ্র মুনিঋষিদের তপোবনে কে আসিতেছে—এ কোন্ রাজাধিরাজ! নিকটে আসিলে সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল সারথির পশ্চাতে হিরণ্ময় আসনে রহিয়াছেন স্বয়ং মহর্ষি অগস্ত্য।

মহর্ষি রথ হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি যে অতুল ঐশ্বর্য্য আনিয়াছি তাহা কোন রাজকুলেও নাই। আমি তোমাকে বিশাল মর্ম্মরনির্মিত প্রাসাদ, দাসদাসী, দেবদুর্লভ সুকোমল শয্যা সকলই দিব। আমি শুধু দেখিতে চাই যোগবলে প্রথমে যে হাস্যময় তোমার মুখমণ্ডল দেখিয়াছিলাম তাহা আবার প্রতিভাত হোক—তুমি সুখী হও, চির অম্লান থাকুক তোমার অপরূপা মূর্তিখানি।

আনন্দে বিহ্বল কণ্ঠে লোপামুদ্রা বলিল,—প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। তপোবলের ক্ষমতায় আপনার অসাধ্য অপ্রাপ্য কিছু নাই। আমি ধন চাহিনা, ঐশ্বর্য্য চাহিনা, চাহিনা সুকোমল বিলাস শয্যা। আপনি বলিয়াছিলেন যে ধনসম্পদ ঐশ্বর্য্য তপশ্চারণ ও অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটায়—পার্থিব এই অতুল সম্পদ আপনি দীনদরিদ্রদিগকে দান করিয়া আমাকে কিছু পুণ্যলাভে সহায়তা করুন। আপনার প্রেম ভালবাসাই আমার ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য অম্লান হোক—এই আশীর্ব্বাদ করুন।

মুক্তির আনন্দে মহর্ষির মুখমণ্ডল হইল উদ্ভাসিত। গভীর আনন্দে বলিলেন,—পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী পাইয়া আমি আজ ধন্য।

লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে প্রণাম করিল।

উলূপী ও অর্জুন

নাগকন্যা উলূপী। নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা ঐরাবত নাগের পৌত্রী সে। রূপে গুণে অপরূপা। পাতালে নাগলোকে সে বাস করে—সেখানে নাই চন্দ্রের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাধুরিমা, নাই সূর্যের করনিকর জালে আবৃত ধরাতল, নাই লক্ষ নক্ষত্রশোভিত নীলাকাশ ও গ্রহ আকাশগঙ্গা, নাই সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রশ্নচিহ্ন। শিশুকাল হইতেই ধরিত্রীপৃষ্ঠের অপরূপ রূপশোভার কথা শুনিত সে। নাগলোক এক অপূর্ব দ্যুতিতে আলোকিত, সমীরণ বিচিত্র নিয়মে প্রবাহিত। অধিবাসী সকলেই নাগবংশসম্ভূত। নাই সেখানে অশোক-পলাশ-অশ্বত্থ-শাল্মলী-তমাল-তালের বনরাজি, নাই নবশ্যাম দূর্বাদল, নাই মরালমরালী বিহারিণী স্বচ্ছ সরোবর।

উলূপী নিজের আলয়, নিজের জন্মভূমি, নিজের নাগবংশকে এতটুকু ভালবাসেনা। সে চাহে ভূপৃষ্ঠের মানবদের মত মুক্ত জীবন, সূর্যের আলোক, চন্দ্রের কিরণ, দক্ষিণ সমীরণ। নাগলোকে এই সব নাই। নাই প্রভাতের বিহঙ্গকুলের কলকাকলি—অস্ত্রের ঝঞ্চনা—পুরুষে পুরুষত্বের বিকাশ। নাগলোকে নাই হানাহানি। এখানে শুধু শান্তি—অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন শান্তি হৃদয়কে আনন্দ দান করেনা। নাগবংশের ক্রূরতা সে জানে। তাহাদের বংশভূত অনেকে নাগলোক ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর বুকে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে বিচিত্র জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করিতে পারে নাই, কিন্তু আশীবিষের দংশনে অনেক নিরপরাধের প্রাণ হরণ করিয়াছে। এজন্য সে চরম লজ্জিত।

দেবরাজ নারদ নাগরাজ বাসুকির পরম বন্ধু। তিনি ভ্রমণপ্রিয়। মাঝে মাঝে তিনি বাসুকির নিকট আসিতেন। দেবর্ষি আসিলে নাগকুলের সকলে তাহাকে পরম সমাদর করিয়া নানা দেশ-বিদেশ ও স্বর্গমর্তের কাহিনী শুনিত।

একদিন উলূপীর উপস্থিতিতে বাসুকি দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধরাধামে শ্রেষ্ঠ মানব কে? বীর্য, জ্ঞান, চরিত্রবল, বংশ, রূপ, গুণ ইত্যাদির সমন্বয়ে কে শ্রেষ্ঠ?

নারদ বলিলেন,—অবশ্যই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি বিষ্ণুর অংশভূত, তাই সঠিক মানবপর্যায়ে পড়েন না। তাহাকে বাদ দিলে ইন্দ্রের অংশভূত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনই শ্রেষ্ঠ মানব। সে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা এবং মানবের সর্বগুণ সমন্বিত। অতএব সে-ই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অর্জুনের নানা বীরকীর্তি বর্ণনা করিয়া নারদ আরও জানাইলেন—বর্তমানে অর্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতখণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছে। শীঘ্রই সে নাগলোকের প্রবেশপথ গঙ্গাদ্বারে আসিয়া পেঁীছিবে।

ব্রহ্মচর্যের কারণও তিনি জানাইলেন। যুধিষ্ঠীর, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পঞ্চভ্রাতা মিলিতভাবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করে। স্ত্রীর উপর অধিকার লইয়া ভ্রাতাদের মধ্যে বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনাকে দূর করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস তাহাদের একটি কঠোর নিয়মে আবদ্ধ করেন—যখন দ্রৌপদী কোন ভ্রাতার কক্ষে অবস্থান করিবে তখন যদি অপর কোন ভ্রাতা ঐ কক্ষে প্রবেশ করে তবে তাহাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্বাসনে যাইতে হইবে। একদিন যুধিষ্ঠীর অস্ত্রাগারের ভিতরে দ্রৌপদীসহ অবস্থান করিতেছিল, এমন সময় এক ব্রাহ্মণের উপকারার্থে দস্যুদমনের জন্য ধনুর্বাণাদি অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মণের মঙ্গলের জন্য অর্জুন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। ফলে তার এই নির্বাসন।

নারদের মুখে ঐসব বিবরণ শুনিয়া উলূপীর হৃদয়ে জাগে এক অপূর্ব বাসনা। মনে মনে অর্জুনকে স্বামীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দ ও পুলকে পূর্ণ হয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, সুযোগ আসিলে অর্জুনকেই বিবাহ করিবে এবং তাহার জন্য যে, কোনো স্বার্থ-ত্যাগ করিতে সে প্রস্তুত। পিতার নিকটে সে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। পিতা জানাইয়াছিলেন—মানবসন্তানকে বিবাহ করিলে তাহার অদৃষ্টে স্বামীসুখ বর্তাইবে না। সে হইবে স্বামী পরিত্যক্তা, পিতৃগৃহে পালিতা। পিতা তাহাকে মানবপুত্র বিবাহ করিতে পুনঃ-পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি অর্জুনকে বিবাহ করিবার বাসনা কেন মনে আসিল তাহা বুঝিতে পারে না। আর্যবংশসম্ভূত পাণ্ডুবংশে নাগকন্যা বধূরূপে গৃহীত হইবে না উত্তমরূপে জানে সে। দ্বিতীয়

পাণ্ডব ভীমসেন রক্ষবংশীয় হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারে তাহার স্থান হয় নাই। হিড়িম্বা স্বামী পরিত্যক্তা—একাকিনী, তবে তাহার ঘটোৎকচ নামে একটি পুত্র আছে। যদি অর্জুনকে বিবাহের পরে তাহারও নিজের একটি পুত্র থাকে—।

অর্জুন সত্যরক্ষার মানসে দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্বাসনে যাত্রা করিলেন। তাহার সঙ্গে চলিল বিশাল এক তীর্থযাত্রীর দল। সেই দলের ভিতরে বেদ-বেদাঙ্গ দিব্যজ্ঞানবেত্তা, পৌরাণিক সূতগণ, ভিক্ষোপ-জীবি সন্ন্যাসী—সকলেই ছিল। গঙ্গাতীর ধরিয়া পূর্বদিকে চলিতে চলিতে যত তীর্থভূমি, রমনীয় স্থান এবং জনপদ ইত্যাদি পড়িল, সবই অতিক্রম করিয়া গঙ্গাদ্বারে সকলে উপনীত হইলেন। গঙ্গাদ্বারের মনোরম শোভা, সমুদ্রমেখলা পরিবৃত বেলাভূমি, তমাল-তাল-নারিকেল কুঞ্জ দেখিয়া এই স্থানে কিছুদিন বিশ্রাম করিতে সকলে মনস্থ করিলেন। তপশ্চারণ অথবা বিশ্রম্ভালাপে আয়ু ও বলবৃদ্ধি হয়, তাই এই স্থানে অস্থায়ী পর্ণকুটির নির্মাণ করিতে লাগিলেন।

একদিন অর্জুন গঙ্গাসলিলে অবগাহন স্নান, পিতৃপিতামহদের তর্পণ ইত্যাদি করিয়া তীরে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইবেন, এমন সময় নাগকন্যা উলূপী সলিল মধ্যে তাহার পদধারণ এবং মোহগ্রস্থ করিয়া একেবারে নাগলোকে নিজ শয়নকক্ষে লইয়া গেল। মোহভঙ্গে বিস্মিত অর্জুন দেখিলেন গৃহকোণে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত। অর্জুন প্রথমে অগ্নিকার্য সমাধা করিয়া উলূপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি ভামিনী! আমি কোথায়? আমাকে এই স্থানে আনয়নের হেতুই বা কি? কি কারণে এই অসম সাহসিক কার্য করিলে বুঝিতেছি না।

উলূপী কহিল'—হে পার্থ! আপনি কে আমি জানি। আমি ঐরাবত কুলোদ্ভব কৌরব্যনাগকন্যা উলূপী। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন আপনি মানবকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমি মনেপ্রাণে শ্রেষ্ঠকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি। আমি আপনাকে পতিরূপে পাইতে চাই। এক্ষণে আপনি আত্মদান দ্বারা এই অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—আপনি এখন নাগলোকে আমার শয়নকক্ষে রহিয়াছেন।

চিন্তিতভাবে অর্জুন বলিলেন;—নাগকন্যা উলূপী, আমাকে পতিত্বে বরণ করা তোমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে। তুমি পরমাসুন্দরী, যে কোন নাগ-মানব-দেবতা তোমার বরমাল্য লাভ করিলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে, মানবজাতির আর্যসমাজে বিশেষতঃ রাজবংশে আর্য ধর্মের

বর্ণভেদ প্রথা অবশ্যই পালনীয়। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ সম্ভব, কিন্তু ভিন্ন জাতি নাগবালাকে অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া অসম্ভব। তাই এই বাসনা ত্যাগ কর উলুপী—কোন নাগযুবককে বিবাহ করিয়া সুখী হও।

উলুপী দৃঢ়স্বরে বলিল,—মানবজাতির বর্ণভেদ, সমাজবিধি সবই ভেদনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা আমি জানি। আমি আরও জানি, যদি আপনাকে পতিরূপে লাভ করি তবে পতিগৃহে আমার স্থান হইবে না—সেক্ষেত্রে আমি হইব চির স্বামী পরিত্যক্তা—পিতৃগৃহবাসিনী। এই চরম দুর্ভাগ্যকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি যদি আমার বরমাল্য আপনি গ্রহণ করেন।

অর্জুন বলিলেন,—তুমি সহসা সলিল মধ্য হইতে আমার পদগ্রহণ করিয়া আমাকে এই স্থানে আনিয়াছ! ঐদিকে আমার সঙ্গী সাথী প্রিয়জনেরা নিশ্চিন্ত ধারণা করিয়াছেন আমি সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গতপ্রাণ হইয়াছি এবং তাহারা শোকার্ত হইয়া হয়তো হাহাকার করিতেছেন। তুমি অপূর্ব সুন্দরী মোহময়ী নাগবালা। তোমাকে এক সর্তে পরিণীতা করিতে প্রস্তুত আছি যদি কল্য প্রভাতেই গঙ্গাদ্বারে আমার প্রিয়জনের নিকটে আমাকে প্রেরণ কর।

সানন্দে উলুপী বলিল,—জীবনে মাত্র এক রাত্রির জন্য স্বামী সহবাস যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন, আমি তাহাতেই সম্মত। শুধু একটি পুত্র প্রার্থনা করি, সেই পুত্র প্রতিভূরূপে আপনার স্মৃতি আমার হৃদয়ে অম্লান রাখিবে।

ঈষৎ হাস্যে অর্জুন উলুপীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। নাগলোকে পুষ্পদল নাই। জ্যোতির্ময় মুক্তামাল্য দিয়া হুতাশন সাক্ষী রাখিয়া গন্ধর্বমতে তাহাদের বিবাহ হইল। উলুপীর একমাত্র বাসনা পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে পতিরূপে লাভ করা—তাহা পূর্ণ হইল।

পরদিন প্রভাতে চিরবিদায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উলুপী বলিল,—আর্যপুত্র! আমি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। নাগলোকে এই শাস্ত্র গভীর এবং সার্থকভাবে আলোচিত হয়। আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতেছি—শীঘ্রই ভয়াল জলচর জীব দ্বারা আপনি আক্রান্ত হইবেন। আপনাকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য বরদান করিতেছি—সকল জলচর জীবই আপনার স্পর্শে হীনবীর্য সর্বশক্তিহীন হইবে। সর্বজাতীয় জলচর প্রাণীকেই আপনি জয় করিবেন।

অর্জুন কহিলেন,—উলুপী! তোমার সহিত এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাত। এ জীবনে আর সাক্ষাত হইবে না।

উলূপী কহিল,—জ্যোতিষশাস্ত্র সেই কথা বলে না। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে আবার আমাদের দেখা হইবে। আপনার প্রস্থানের পর নাগলোকের জ্যোতিষপ্রধান ভবিষ্যৎবক্তার সহিত আমি আলোচনা করিয়া জানিব আপনার এবং আমার কি ললাটলিখন।

অর্জুন কহিলেন,—উলূপী, সময় বহিয়া যাইতেছে, শীঘ্রই আমাকে প্রিয়জনসমীপে উপস্থিত কর।

উলূপীর এই বরদান এবং ভবিষ্যৎবাণী অর্জুন কিছুই বিশ্বাস করিলেন না। মনে করিলেন এইসব কথাগুলি নাগবালার ছলনামাত্র। মুখে কিছুই বলিলেন না।

উলূপী তাহাকে নদীতীরের যথাস্থানে লইয়া আসিয়া বলিল,—আমি চলিলাম। গঙ্গাদ্বারে আসিয়া সলিল স্পর্শ করিয়া আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব।

সজল নয়নে উলূপী তাহার একদিন ও রাত্রির পতিকে বিদায় দিয়া পুনরায় নাগলোকে প্রস্থান করিল। তাহার হৃদয়ে হরিষে বিষাদ। সে জানিত যে সে হইবে চির পতি পরিত্যক্তা—ইহাই তাহার ভাগ্যলিপি।

অর্জুন পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। সঙ্গের তীর্থযাত্রীর দল দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পাইল। এ যাত্রায় নাই নৈরাশ্য—একাকীত্ব। শেষে পূর্বদিকের তীর্থসমূহ শেষ হইয়া পুনরায় পশ্চিমদিকে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অর্জুনের ইচ্ছা হইল অরণ্য বনাঞ্চল—পর্বতমালা শোভিত পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইবেন।

এইরূপ সংকল্প করিয়া সঙ্গী তীর্থযাত্রীদের নিকট বিদায় লইয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে করিতে মনিপুরে উপস্থিত হইলেন।

মনিপুরের রাজা পরম ধার্মিক। কিন্তু রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। বংশরক্ষার জন্য মহাদেবের তপস্যা করিয়া তিনি বর লাভ করেন যে অচিরেই তাহার একটিমাত্র সন্তান জন্মিবে। সন্তানটি কন্যা হইলে সেই কন্যা স্বামীগৃহে যাইবে না। তাহার গর্ভস্থ সন্তান মনিপুর রাজবংশের সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে—সে পিতৃকুল পাইবে না।

সেই অনুসারে মনিপুর রাজার চিত্রাঙ্গদা নামে একটি মাত্র বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। তাহাকে পুত্রিকারূপে পালন করিয়া যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাদান করিয়াছিলেন রাজা।

চিত্রাঙ্গদা অরণ্যে শিকাররত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মচারী বেশী অর্জুনকে দেখিতে পাইল। উভয়ের সাক্ষাতের পর পরস্পরের

পরিচয় আদানপ্রদানে অনুরাগের সঞ্চার হইল উভয়েরই অন্তরে। এবং অর্জুন মনিপুর রাজার নিকটে গিয়া কন্যার পানিপ্রার্থনা করিলেন। অর্জুনের পরিচয় পাইয়া মনিপুররাজ সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং বংশের রীতি তাহাকে জানাইলেন। অর্জুনের সম্মতি পাইয়া মনিপুররাজ তাহাকে এই সর্তে আবদ্ধ করিলেন যে যতদিন চিত্রাঙ্গদায় কোন সন্তান না জন্মায় ততদিন তিনি মনিপুরে অবস্থান করিবেন।

অর্জুন সকল সর্তে সম্মত হইয়া মনিপুরে তিন বৎসর অবস্থান করিলেন। তাহার বভ্রুবাহন নামে একটি পুত্র জন্মিলে তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া দ্রুত পশ্চিম অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

অর্জুন চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে পথে নূতন তীর্থযাত্রী-পরিব্রাজক দলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে নূতন নূতন তীর্থাদি পরিদর্শন করিতে করিতে এক বিশাল সরোবরের তীরে সকলে উপনীত হইলেন। আশ্চর্য্য! সেই সরোবরের তীরবর্তী অঞ্চল জনপদ-শূন্য। কোনো-মরালমরালী উহার জলে ক্রীড়া করিতেছে না। পথে জনমুখে সকলেই শুনিলেন এই সরোবরে এক বিশালকায় হিংস্র কুম্ভীর বাস করে। কোন প্রাণী জলে নামিবামাত্র ঐ কুম্ভীর প্রাণীটিকে সংহার করে। পূর্বে ইহা সৌভদ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনমুখে শ্রুত হইল যে, এইরূপ ভয়াল নক্র আশ্রিত আরও চারিটি পরিত্যক্ত তীর্থ-সরোবর আছে।

জনমুখে এইসব প্রচলিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া অর্জুন সহসা ভাবান্তরিত তথা আত্মবিস্মৃত হইলেন। এবং সঙ্গীদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সলিলে অবগাহন স্নান করিতে লাগিলেন। চকিতে এক ভয়াল কুম্ভীর তাহার পদধারণ করিয়া আকর্ষণ করিল। এদিকে অর্জুনের দেহেও শত হস্তীর বল সঞ্চারিত হইল। তিনি অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্র সফরীর মত ঐ কুম্ভীরটিকে ধারণ করিয়া তীরে উত্থিত হইলেন। পরক্ষণেই আশ্চর্য এক দৃশ্যের অবতারণা হইল।

ঐ কুম্ভীরটি এক পরমা সুন্দরী সালংকারা দিব্যাঙ্গনা রূপ ধারণ করিয়া অর্জুনের পদতলে প্রণাম করিয়া বলিল,—হে অর্জুন! আমার নাম অপ্সরা বর্গা। আমি এবং আমার চারিজন সঙ্গিনী গুরুতর অপরাধের জন্য এক তপস্বীর অভিশাপে শত বৎসর কুম্ভীর হইয়া পঞ্চ সরোবরে বাস করিতেছি। অনেক অনুনয় বিনয় এবং ক্রন্দনের পরে তপস্বী আমাদের জানাইয়াছিলেন—'কোন মানব যদি তোমাদের সলিল হইতে উত্তোলন করে তবেই শাপমুক্ত হইবে।' সেই অবধি কেহ সলিলে

অবগাহন করিলেই পদধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করি। আপনার স্পর্শে আজ আমি শাপমুক্ত হইলাম। আপনি দয়া করিয়া আমার অপর চারিজন সঙ্গিনীদেরও শাপমুক্ত করিয়া তীর্থগুলি পবিত্র করুন।

অর্জুন বর্গার অনুরোধে সকলকেই শাপমুক্ত করিলেন।

বর্গা বলিল,—আপনার পত্নী নাগকন্যা উলুপী এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ দেখিয়া আপনাকে জলচরজয়ী বর প্রদানের দ্বারা আপনার প্রাণরক্ষা এবং আমাদের শাপমুক্ত করিয়াছেন। বরপ্রভাবে আপনার পদে একটি দন্তাঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত হয় নাই। আমরা অপ্সরী—দেব অংশের অলৌকিক ক্ষমতার সামান্য অধিকারী। আপনাকে অনুরোধ করিতেছি আপনি ফিরিবার পথে নাগলোকে উলুপীর সহিত সাক্ষাৎ করুন। তিনি আপনার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছেন এবং সাগ্রহে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গঙ্গাদ্বার—নাগলোকে যাইবার প্রবেশ দ্বার। এইবার অর্জুন নিঃসঙ্গ—একাকী। গঙ্গা সলিলে নামিয়া তিনি উলুপীকে স্মরণ করিলেন। উলুপী তৎক্ষণাৎ সলিল হইতে উত্থিত হইয়া প্রসন্ন হাস্যে স্বামীর হস্তধারণ করিয়া নাগলোকে নিজ শয়নকক্ষে লইয়া গেল। মাত্র এক দিবা ও রাত্রির পরিচয়। ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চম বর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পরে আজ স্বামী সন্দর্শনে উলুপী আনন্দে বিহ্বল হইল।

কক্ষমধ্যে একটি সুদর্শন বালক এই সময়ে ক্রীড়া করিতেছিল। তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া উলুপী কহিল,—এটি আপনার প্রথম পুত্র ইলাবন্ত। জীবনে নিজের পিতৃসন্দর্শন করে নাই। আপনি ক্রোড়ে লইয়া এখন একে কৃতার্থ করুন।

নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাৎসল্যরসে অর্জুনের হৃদয় পূর্ণ হইল। পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—আমার আসিবার কারণ আমার ভাগ্যলিপি জানিবার ইচ্ছা। অপ্সরাগণের নির্দেশে এইস্থানে আমি আসিয়াছি।

উলুপী বলিল,—আর্যপুত্র! আমি গণনায় জানিয়াছি পাণ্ডব-কৌরব-উভয়পক্ষ ভয়াবহ জ্ঞাতিযুদ্ধে লিপ্ত হইবে। সেইদিন এই অনাদৃত পুত্র পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিবে। প্রাণ দিবে ভীম-তনয় চিরবিস্মৃত ঘটোৎকচও। পিতার প্রতি পুত্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে তাহাদের মাতা সন্তানদের মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিবে।

অর্জুন অবনতমুখে উলুপীর সকল কথা শুনিতেছিলেন।

শান্তস্বরে উলূপী পুনরায় বলিল,—আমার প্রদত্ত বর প্রভাবে কুম্ভীর-রূপী অপ্সরাদের আপনি উদ্ধার করিয়াছেন। আর জানিয়া রাখুন আমার নিকটে বংশপরম্পরায় একটি নাগমণি রক্ষিত আছে। উহা দ্বারা আমি মাত্র একজন মৃতকে পুনর্জীবন দানে সক্ষম। ঐ নাগমণিটি রক্ষিত থাকিবে আমার একমাত্র সন্তানের জন্য নয়—কেবল আপনার জন্য।

বিস্মিত হইয়া অর্জুন বলিলেন,—আমার জন্য! আমি গাণ্ডীব-ধন্য কৃষ্ণসখা—অমিতবিক্রমশালী সমরবিজয়ী। আমাকে পরাজিত অথবা নিহত করিতে পারে এমন কেহ এই ভূমণ্ডলে নাই। ঐ নাগমণি তুমি তোমার পুত্রের উপরে প্রয়োগ করিও নাগবালা।

আহত স্বরে উলূপী বলিল,—আত্মশ্লাঘা মহাপাপ বলিয়া জানি—জগতে কেহই অপরাজেয় নহে। আমার পুত্র সম্মুখ সমরে ন্যায়যুদ্ধে পরার্থে নিহত হইয়া অমৃতলোকবাসী হইবে। কিন্তু স্বামি! আপনার 'পরাজয় ও মৃত্যু হইবে অন্যায় সমরে—আত্মা হইবে' নিরয়গামী। পরম গুরুজনকে অন্যায়' সমরে নিহত করিয়া আপনি হইবেন অভিশপ্ত, সে অভিশাপ পুত্র হস্তে নিহত হইবার অভিশাপ। আপনি সুদূর ভবিষ্যতে একমাত্র জীবিত পুত্র বব্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন তাহার মাতা আপনারই পরিণীতা স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার পত্নীত্ব অস্বীকার করিবার জন্য। পুত্র মাতার চরম অবমাননার জন্য আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। সাধ্বীস্ত্রীর দীর্ঘশ্বাসে আপনার সর্বশক্তি হইবে অপহৃত—হইবেন হীনবল। মাতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে মাতৃভক্ত পুত্র। আপনার প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ পাপীকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইবেন—সেই অনুসারে আপনার আত্মা হইবে নিরয়গামী।

স্তম্ভিত হইলেন অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা, বব্রুবাহন প্রভৃতির নাম উলূপী জানিল কিরূপে! স্খলিত স্বরে বলিলেন,—তোমার বরদান ও ভবিষ্যৎবাণী আর আমি অবিশ্বাস করিনা উলূপী। মতিভ্রমে যদি অভিশপ্ত ও অন্যায় সমরে নিহত হই তাহা হইলে নরকবাস হইতে আমায় তুমি উদ্ধার করিও।

শান্তস্বরে উলূপী বলিল,—আমার পুত্র মৃত্যুর পরে অমৃতলোক-বাসী হইবে, আর আমার স্বামী যাইবে নরকে—ইহা অসম্ভব। প্রথমেই বলিয়াছি আমার রক্ষিত নাগমণি মাত্র একজনের পুনর্জীবন দান করিতে সক্ষম। তাহা আপনার জন্যই রক্ষিত থাকিবে। এইবার আপনি পশ্চিমে প্রভাস তীর্থে যাত্রা করুন। আপনার নির্বাসন কালের দ্বাদশ বৎসর শেষ হইতে অধিক বিলম্ব নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রভাস তীর্থে

আপনার প্রতীক্ষারত রহিয়াছেন। সেখানে লাভ করিবেন আপনার জীবনসঙ্গিনী—আমার মত পরিত্যক্তা পত্নী নহে। এখন বিদায়। পুনর্জীবনকালে আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে—উলূপী ক্ষণেকের জন্যও কর্তব্য ভুলিবে না।

উলূপী অর্জুনকে ভূপৃষ্ঠে লইয়া আসিল। উলূপীর নির্দেশে এইবার অর্জুনের যাত্রাপথের লক্ষ্যস্থল হইল প্রভাসতীর্থ।

অর্জুনকে বিদায় দিয়া উলূপী আপন কক্ষে ফিরিল এবং নিজ সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া আকুল ক্রন্দনে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। সন্তানের চাইতেও কি মাত্র এক রজনীর স্বামী বড়? এক দিন ও রাত্রির পরই তো সে পতি পরিত্যক্তা হইয়াছে। কে বড়—পুত্র, না স্বামী! কাহার প্রাণ তাহার নিকটে বেশী মূল্যবান—বেশী আদরের! উত্তর পাওয়া যায় না।

অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল উলূপীর।

কচ ও দেবযানী

অমরাবতীর অধিকার লইয়া দেবতাগণের সহিত অসুরদের অবিরাম যুদ্ধ চলিত।

ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতি—জ্ঞান, বিদ্যা ও চরিত্র বলে আদর্শ। দেবতাগণ তাহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

ব্রহ্মার বক্ষদেশ হইতে উৎপন্ন হন মহর্ষি ভৃগু। তাহার পুত্র শুক্র—ইনি ভৃগুবংশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাণী। দৈত্য দানবগণ এই শুক্রকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

গুরুপদে বৃত হইয়া উভয়ে স্ব স্ব শিষ্যদের মঙ্গলচিন্তা এবং যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

সেই সময়কালে অমৃত পান করিয়া দেবগণ অমরত্ব লাভ করেন নাই।

এদিকে তপস্যা ও অধ্যবসায় বলে শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আবিস্কার করিলেন। ইহার ফলে দেবাসুর সংগ্রাম এক নূতন পর্য্যায়ে উপনীত হইল। যুদ্ধে কোন দৈত্য খণ্ড বিখণ্ড হইলে অথবা দানব নিহত হইলে শুক্রাচার্য্য তাহাকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবন দান করিতেন। কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি তাহা পারিতেন না। গুরুর কৃপায় এই বিদ্যার বলে অসুরগণ অনায়াসে অমরাবতী অধিকার করিতে পারিত; কিন্তু শুক্রাচার্য্যের তাহাতে অসম্মতি ছিল বলিয়া দানবরাজ বৃষপর্বা নিজ রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

দেবতারা বুঝিলেন শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রবলে অসুরগণ অজেয়, কিন্তু কোনক্রমে কেহ যদি শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে ঐ বিদ্যা আয়ত্ব করিয়া ফিরিতে পারে তাহা হইলে দেবগণ পুনরায় দৈত্যদানবদের সমকক্ষ হইবে। তাহারা ইহার একটি উপায় চিন্তা করিলেন। তাহারা জানিতেন যে শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নামে এক সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ রূপ, গুণ, বিদ্যা ও বংশের গৌরবে দেবযানীর উপযুক্ত পাত্র। যদি কচ গিয়া শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চায় তবে প্রথা অনুসারে শুক্রাচার্য্য তাহাকে গুরুগৃহে আশ্রয় দিবেন। সেই অবসরে যদি কচ গুরুকন্যার হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিতে পারে তবে তাহার পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ব

করা সম্ভব। তাহারা আরও জানিতেন শুক্রাচার্য্য যদিবা শিষ্য অথবা জামাতাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আত্মজা দেবযানীকে অদেয় কিছু নাই।

সেদিন অপরাহ্নে দেবযানী আশ্রমসংলগ্ন পুষ্পকাননে জলসিঞ্চন করিতেছিল। ইহা তাহার নিত্যকর্ম। আশ্রমের চারিপার্শ্বে বিরাট অঞ্চল লইয়া বিশাল প্রাকার—মধ্যবর্তী স্থলে আচার্য্যের বাসগৃহ। বাসগৃহের চারিপার্শ্বে নীপ, বকুল, অশোক, চম্পক এবং নাগ জাতীয় পুষ্পবৃক্ষের সমারোহ। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পুষ্পকুঞ্জাদি শোভিত মণ্ডপ। দানবরাজ বৃষপর্বা গুরুকন্যার মনোরঞ্জনের জন্য নানা জাতীয় পুষ্পলতা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। প্রাকারের ভিতরে কোন দানব-প্রজার প্রবেশের অনুমতি ছিল না। একজন শূদ্র ভৃত্য এবং পরিচারিকা ঘূর্নিকা তাহাদের পরিচর্য্যা করিত।

সেদিন রাজসভা হইতে পিতার ফিরিবার সময় হইয়াছে। জলসিঞ্চন করিয়া একটি সুন্দর পুষ্পস্তবক রচনা করিয়া দেবযানী প্রতিদিনকার মত পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় দেখিল পিতা একজন পরম রূপবান জ্যোতির্ময় যুবককে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। দেবযানীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দানবপুরে শূদ্র ব্যতিরেকে কোন দেব মানব ইত্যাদি জাতি নাই। আগন্তুক যুবকটির শরীরে পিতার মত দিব্যজ্যোতি পরিস্ফুট। এ মানব নয়—নিশ্চিত দেবঅংশ সম্ভূত। বেশভূষায় ব্রহ্মচারী।

পিতা যুবককে লইয়া নীকটবর্তী হইতেই বিহ্বল দেবযানী পিতার পরিবর্তে যুবককেই পুষ্পস্তবক দান করিল। যুবক স্মিতহাস্যে উহা গ্রহণ করিল। শুক্রাচার্য্য হাসিয়া কহিলেন,—এ আমার পরমাত্মীয় দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ, আমার নিকটে বিদ্যাচর্চা এবং ব্রত শিক্ষার জন্য আসিয়াছে—আমি ইহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছি। তুমি সঙ্গীবিহীন একাকী—ইহার সাহচর্য্যে তোমারও চিত্ত প্রসন্ন থাকিবে।

শুক্রকন্যা দেবযানী সানন্দে বৃহস্পতিপুত্রকে অভ্যর্থনা করিল।

শুক্রাচার্য্য কচের আগমনের হেতু বুঝিয়াছিলেন। মনে মনে সতর্ক হইলেন। উপযুক্ত বিদ্যার্থী শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আসিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা আচার্য্যধর্ম নহে—বিশেষতঃ বৃহস্পতি পুত্রের মত শিষ্য! দেবযানীও বিবাহের উপযুক্তা। যদি উভয়ে উভয়কে মনপ্রাণ সমর্পণ করে তবে তিনি বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন।

কচের মত সর্বাংশে সুপাত্র তাঁহার একান্ত কাম্য। তিনি দেবযানীর সহিত কচের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। না—কচের মন স্বচ্ছ, নির্মল। অবিবাহিতা কন্যার সহিত আচরণে তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ-রঞ্জিত ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন।

বিচলিত দেবযানীও। কচকে দেখিবামাত্র তাহার ভাল লাগিয়াছিল। পরিচয় পাইয়া ভাবিয়াছিল পিতা ইচ্ছাকৃতভাবে পাত্র নির্বাচন ও পরীক্ষার জন্য ইহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। দেবযানী যদি কচকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে চায় তাহা হইলে কচকে জামাতারূপে গ্রহণ করিতে সম্ভবতঃ আচার্য্যের পূর্ণ সম্মতি থাকিবে ; সুতরাং—।

চিন্তিত হয় দেবযানী। সে ও কচ দুইজনে পূজার পুষ্পচয়ন করে, দেবযানী সুন্দর কুসুমমালিকা রচনা করিয়া প্রায়শই কচের হস্তে দেয়—উদ্দেশ্য, কচ যেন উহা দিয়া তাহার কবরী সজ্জিত করে। কিন্তু পুষ্পমাল্যে শুধু গুরুদেবের শয়নকক্ষ এবং পূজাস্থান সজ্জিত করে কচ, দেবযানীর ছলনা, চটুলতা, ইঙ্গিত—কোন কিছুতেই সাড়া দেয় না। কচের এই প্রকার আচরণ ক্লীবতুল্য মনে হয় তাহার। নির্জনে দুইজনের সাক্ষাতে কোনরূপ সরসালাপ অথবা উজ্জ্বল আনন্দের আভাষ দেখা যায় না। দেবযানী ভাবে—তবে কি কচ তাহার প্রতি অনুরাগী নহে !

চিন্তিত হন শুক্রাচার্য্য। তিনি ভাবিয়াছিলেন অপরূপা নবযৌবনা তাহার কন্যার সহিত সাহচর্য্যে কচের হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার অনিবার্য্য হইবে। সেক্ষেত্রে তাহাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বিবাহে সম্মতি দিতে হইবে। তিনি কচের আগমণের উদ্দেশ্য জানেন এবং জামাতাকে যৌতুক হিসাবে মন্ত্রশিক্ষা দিবার বাধা কোথায় ? কিন্তু কচের আচরণে বিন্দুমাত্র প্রণয় সঞ্চারের লক্ষণ না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তবে কি কচ গুরুকন্যাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ?

চিন্তিত হইলেন বৃহস্পতিনন্দন কচও। গুরুতর দেবকার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে সে এই শত্রুপুরীতে আসিয়াছে। শুক্রাচার্য্য তাহাকে সাদরে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস করিয়া নবযৌবনা কন্যার সহিত সাহচর্য্য আলাপনের অবাধ সুযোগ দান করিয়াছেন। কিন্তু কেন ? ইহা হয়ত তাহার চরিত্রবল পরীক্ষার নিমিত্ত ! যদি নিষিদ্ধ প্রণয়ে আচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিতাড়িত করেন ! দেবযানীর প্রতি সেও অনুরক্ত, কিন্তু শুক্রাচার্য্য তাহাকে এই বিষয়ে কণামাত্র আভাষ দেন নাই বলিয়া সে অতি সতর্ক। যদি কোন আচরণে আচার্য্য তাহার ত্রুটি ধরেন ?

আচার্য্য তাহাকে শুধু প্রাকারের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নাকি তাহার জীবনসংশয় অনিবার্য্য। এই উদ্যান ও প্রাকারের ভিতরে সে নিরাপদ।

ওদিকে বিশেষ ভাবে চিন্তিত দানবরাজ বৃষপর্বা। তিনি অনুমান করিয়াছেন কচ দেবগণের হিতার্থে দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত গুপ্তচর—উহার শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য আচার্য্যের নিকট হইতে শুধু মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষালাভ। শুক্রাচার্য্য ধর্ম অনুযায়ী তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, পরে যদি জামাতারূপে গ্রহণ করেন তবে তাহাকে হয়ত যৌতুকস্বরূপ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিতে পারেন। তাহা হইলে দানবজাতি আর অপরাজেয় থাকিবে না। অতএব যেমন করিয়া হউক কচকে বধ করিতে হইবে। সেই কালে গুপ্তচর নিধন করা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত বিধান ছিল যদিও গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, তবুও দানবকুলের মঙ্গলের জন্য তিনি মনস্থির করিয়া অনুচরদের যথাযথ ইতিকর্তব্যের নির্দেশ দিলেন।

সেদিন গোপালক অনুপস্থিত, কারণ সে অসুস্থ। গোপালকের অনুপস্থিতির জন্য দেবযানী চিন্তিত হইল। আশ্রমের গাভীগুলির খাদ্যসংগ্রহ ও চারণের কি ব্যবস্থা হইবে? পিতা প্রভাতেই রাজদরবারে গিয়াছেন, তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। ইত্যবসরে অভুক্ত গাভীগুলি খাদ্যের জন্য চঞ্চল হইয়াছে—নিরুপায় দেবযানী গোচারণের জন্য কচকে অনুরোধ করিল। সাবধান করিয়া দিল দানবদের নিকট হইতে তাহার কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে, অতএব সে যেন বেশী দূরে না যায়।

ওদিকে বৃষপর্বার অনুচরগণ সুযোগের সন্ধানে ছিল। সেই সুযোগ আজ হঠাৎ পাওয়া গিয়াছে। কচকে একাকী পাইয়া তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ শৃগাল কুক্কুরদের মধ্যে বিতরণ করিল। পরম শত্রু নিপাত হইয়াছে—এই সুসংবাদ অতঃপর অনুচরেরা হৃষ্টচিত্তে দানবরাজকে জানাইল।

শুক্রাচার্য্যের গৃহে তখন ভিন্ন অবস্থা। কচ ফিরিতেছে না—অথচ গাভীগুলি ফিরিয়া আসিয়াছে। দেবযানী আশঙ্কায় ব্যাকুল হইল। শুক্রাচার্য্য আশ্রমে ফিরিয়া উদ্বিগ্ন কন্যার নিকটে সকল সংবাদ শুনিয়া ধ্যানে বসিলেন। কচ সংক্রান্ত সকল ঘটনাই তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া আসিল। বেদনার্ত হৃদয়ে তিনি বলিলেন,—কচ ফিরিবে না। বৃষপর্বার

আদেশে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে দানবগণ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহার খণ্ডবিখণ্ড দেহ শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি নিশ্চয় বুঝিয়াছ এখানে কচের আগমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এ দণ্ড অবশ্যই তাহার প্রাপ্য।

কচের ঐপ্রকার পরিণতি শুনিয়া দেবযানী আকুল হইল। সে নিজেই যে কচের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী! কারণ তাহারই অনুরোধে কচ প্রাকারের বাহিরে গিয়া নিহত হইয়াছে জানিয়া অনুতাপের অন্ত রহিল না। ক্ষোভ, শোক ও অনুতাপের জ্বালায় বিদ্ধ হইয়া আকুল ক্রন্দনে আশ্রম মুখরিত করিয়া তুলিল সে। আকুলভাবেই সে পিতার নিকটে কচের প্রাণদানের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল, বলিল,—পিতা, একমাত্র আমার প্রেমের জন্য সে নিহত এবং হিংস্র শ্বাপদকুল কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। আপনার মন্ত্রে তাহাকে পুনর্জীবিত করুন।

শিষ্য দানবকুলের মঙ্গল চিন্তায় বিব্রত শুক্রাচার্য্য প্রথমে দেবযানীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইহাতে ব্যথিতচিত্ত দেবযানী আমরণ অনশনের সংকল্প গ্রহণ করিল। তাহার আকুল ক্রন্দনে ক্রমশঃ আশ্রম ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

শুক্রাচার্য্য বুঝিলেন দেবযানী সত্য সত্যই কচকে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, কচকে জীবিত না দেখিলে নিশ্চিত অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে সে। তখন নিরুপায় হইয়া তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগে সম্মত হইলেন এবং যোগাসনে বসিয়া সমগ্র চিন্তাসত্তাকে অন্তর্মুখি করিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন।

বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হইয়া দেখিল—প্রতিটি শৃগাল কুক্কুরের উদর বিদীর্ণ হইয়া ভক্ষিত কচের খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ডগুলি পুনরায় একত্রিত হইয়া পূর্ণ কচের রূপ ধারণ করিল। কিছুই যেন হয় নাই তাহার—এতক্ষণ যেন সে নিদ্রিত ছিল।

ইহার পর কচ ও দেবযানী উভয়েই অতি সতর্ক হইল। তথাপি সামান্য অসতর্কতায় কচ পুনরায় দানবরাজের অনুচরগণ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইল। এবার তাহার দেহ ভস্ম করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করা হইল। পুরাতন নাটকের পুনরাবৃত্তি ঘটিল আবার। কচ জীবিত হইয়া আশ্রমে ফিরিল।

ইতিমধ্যে কচের পাঠ্যকাল শেষ হইয়াছে। পর দিন গুরুদক্ষিণা দিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইবে সে। কোনোপ্রকারেই কিন্তু মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তাহার শিক্ষালাভ হইল না। সদাসতর্ক গুরুদেবের

নিকট হইতে সেই কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালাভের সুযোগ উপস্থিত হইল না কোনোদিনই।

শেষ আশা ছিল দেবযানীর পানিগ্রহণ করা। দেবযানী তাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহার জীবন দান করিতে পিতাকে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু শুক্রাচার্য্য নিজে কোন দিন বিবাহের প্রস্তাব অথবা ইঙ্গিত দেন নাই।

শত্রুপক্ষের হস্তে তিনি কন্যা দান করিবেন না—এই বিশ্বাস কচের হৃদয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যদিও দেবযানীর প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। সে উদভ্রান্তের মত উদ্যানে পদচারণা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে একবার প্রাকারের দ্বারপথের বাহিরে গেল।

এবারেও সেই একই ঘটনা সংঘটিত হইল। লুক্কাইত দানবরাজের অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত এবং হত্যা করিয়া তাহাকে অগ্নিতে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিল। শুক্রাচার্য্যের জন্য রাজবাটী হইতে প্রতি সন্ধ্যায় একজাতীয় উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত হইয়া আসিত এবং তিনি তাহা পান করিতেন। এইদিন অনুচরগণ কচের ভস্মীভূত দেহের ভস্মরাশি ঐ সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রাচার্য্যকে পান করিতে দিল। অজ্ঞাতসারে তিনি ঐ সুরা পান করিলেন। এবার কচের দেহভস্ম এইরূপে শুক্রাচার্য্যেরই উদরে প্রবেশ করিল। তিনি দানবদের এই অপূর্ব চাতুরী বুঝিলেন না।

কচের পুনরায় হত্যা-নাটকের একই দৃশ্য, কিন্তু এইবার সেই দৃশ্য ভিন্ন প্রকৃতির এবং বড়ই বিচিত্র। ধ্যানে শুক্রাচার্য্য জানিলেন কচের দেহভস্ম তাহার উদরেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি কন্যাকে হতাশভাবে বলিলেন,—আমি এইবার নিরুপায়।

দানবদের কৌশলে কচের দেহভস্ম তাহার উদরে। সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই উদর বিদীর্ণ করিয়া কচ পুনর্জীবন লাভ করিবে বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

এইবার সংকট অতিশয় তীব্র হইল। একদিকে পিতার মৃত্যু অন্যদিকে কচের পুনর্জীবন—সমাধান ভাবিয়া পাইল না দেবযানী, তথাপি সে শোকে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ভূতলে লুটাইয়া অশ্রুধারায় সিক্ত করিতে লাগিল আশ্রমের ধূলিকণা।

উহা দেখিয়া বিচলিত হইলেন শুক্রাচার্য্য। অবশেষে স্নেহের জয় হইল। কন্যার ঐ অবস্থা দেখিয়া কন্যাগতপ্রাণ শুক্রাচার্য্য একটি উপায় বাহির করিলেন। ইহাতে কচ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আয়ত্ব এবং পুনর্জীবন

লাভ দুইই করিবে। ভবিতব্য স্মরণ করিয়া তিনি মন্ত্রের অর্দ্ধাংশ প্রয়োগ করিলেন। ইহাতে কচ পুনর্জীবিত হইয়া ক্ষুদ্রাকারে উদরে অবস্থান করিতে লাগিল—দেহ বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিল না।

গুরু কহিলেন,—কচ, তুমি এক্ষণে আমার গর্ভস্থ পুত্র। আমি তোমাকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দান করিতেছি—গর্ভে অবস্থান করিয়া এই মন্ত্র তোমাকে আয়ত্ব করিতে হইবে। তাহার পর মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র আমার উদর বিদীর্ণ করিয়া পূর্বরূপ ধারণ করিবে। ইহাতে পরমুহূর্তেই আমার অসীম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটিবে। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—তুমি বহির্গত হইবামাত্র ঐ মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া আমাকে পুনর্জীবিত করিবে।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল কচ। গর্ভে অবস্থানকালে মন্ত্রটি আয়ত্ব করিয়া লইল এবং পরে গুরু শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র শুক্রাচার্য্যের উদর বিদীর্ন করিয়া স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হইল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্তেই কচ প্রতিজ্ঞামত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শুক্রাচার্য্যকে পুনর্জীবন দান করিল।

পুনর্জীবিত হইয়াই গুরুদেব শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

ইহার পর কচের প্রকৃতই বিদায়ের কাল আসন্ন হইল। কচ গুরুকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল,—পিতা, বলুন কি দিব আপনার গুরু-দক্ষিণা! আমি সাধ্যাতীতভাবে আপনার অভিপ্রেত কার্য্যাদি করিয়াছি এবং করিবও।

শুক্রাচার্য্য বিচলিত হইলেন। তাঁহার মনোবাসনা 'বলিব বলিব' করিয়াও বলিতে পারিলেন না—যদি শত্রুপক্ষের শিষ্য গুরুকন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে! আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিলেন,—তোমার নিকটে আমার প্রাপ্য কিছুই নাই, আমি সন্তুষ্ট। দেবযানীর প্রার্থনা কিছু থাকিলে তাহা পূর্ণ করিও।

সর্ব্বশেষে দেবযানীর নিকটে বিদায় লইতে গেল কচ। দেবকান্তি শুভ্র জ্যোতির্ময় যুবক দেবযানীর সমগ্র হৃদয় বরাবরই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কচ শেষমুহূর্তেও নির্বিকার!

দেবযানীর দুই চক্ষু বাহিয়া অঝোরে অশ্রুধারা বহিতেছিল। ইহা তাহার প্রথম প্রেমের মাধুরিমা—তাহা কি ব্যর্থ হইবে!

কচ দেবযানীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিল,—বল দেবযানী

কি তোমার প্রার্থনা—গুরুদেবের আদেশে তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

দেবযানী দাঁড়াইয়া উঠিয়া অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ বলিল,—আমি তোমাকেই পতিরূপে চাই কচ। তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর বৃহস্পতিনন্দন।

বিচলিত কণ্ঠে বলিল কচ,—এ বিবাহ অসম্ভব—সনাতন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তুমি আমার ভগিনী দেবযানী।

ভগিনী!—দেবযানী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—তোমার ভগিনী হইতে চাহি না, একান্ত আপনভাবে পাইতে চাহি তোমাকে, চাহি প্রিয়সখি হইতে, তোমার প্রিয়তমা হইবার জন্য আমি তোমাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি কচ।

তাহা হয় না দেবযানী—শান্ত কণ্ঠে বলিল কচ,—তুমি যে পিতার সন্তান আমিও সেই পিতার স্বগর্ভজাত। এখন তুমি আমার ভগিনী—এ ন্যায়ত ধর্মত স্বতঃসিদ্ধ। তোমার আমার বিবাহসূত্রে মিলন অসম্ভব। এই জাতীয় বিবাহ আর্য্যখণ্ডে তো নহেই, অনার্য্যকুলেও সম্ভব নহে। আমাকে ক্ষমা কর ভগিনী।

দলিতা ফনিণীর মত গর্জিয়া উঠিল দেবযানী,—ইহা তর্কবিতর্ক নয় কচ—ইহা আত্মপ্রতারণা। তুমি বৃহস্পতি তনয়—তোমার আত্মা ও দেহ তোমার পিতৃকুল জাত—দৈববশে আমার পিতৃগর্ভে ক্ষণিক অবস্থানের জন্য সত্য বিকৃত হয় না। নিজেকে প্রশ্ন কর—কেন তোমার চক্ষে দেখিয়াছি অনুরাগের অভিব্যক্তি,—বাহিরে অপ্রকাশিত হইলেও অন্তরে তাহা বিভাসিত। বার বার কেন তোমার পুনর্জন্ম দান করিতে পিতাকে বাধ্য করিয়াছি তাহা জান কি? আমি তোমার ভগিনী নহি, তুমিও আমার ভ্রাতা নহ। তোমার যুক্তি অসম্ভব—অলীক। পিতাকে জিজ্ঞাসা কর কি তাহার অভিমত।

শান্তস্বরে বলিল কচ,—কন্যাস্নেহে অন্ধ তোমার পিতা হয়তো এই বিবাহে সম্মতি দিতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না। ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব—প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দ্দেশ অমান্য করিলে স্বর্গচ্যুতি হইবে ও অনন্ত নরকবাস ভোগ করিতে হইবে। আমি কিছুতেই ধর্ম-চ্যুত হইতে পারিব না—আমাকে ক্ষমা কর ভগিনী।

ক্রমে দেবযানীর অনুনয় আবেদন প্রার্থনা ক্রোধে পরিণত হইল। বলিল,—বুঝিয়াছি তুমি হীন গুপ্তচররূপে এত দিন আমাদের গৃহে অবস্থান করিয়া কৌশলে আমার হৃদয় জয় করিয়াছ। আমার আবেদনে

অনুরোধে বার বার তুমি পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার পিতা তোমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল তাঁহার একমাত্র 'স্নেহধন্যা' কন্যাকে তোমার হস্তে দান করিবেন বলিয়া। সেই চিত্তদৌর্বল্যের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া এক্ষণে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহ। আমি অভিশাপ দিতেছি—তোমার অধীত বিদ্যা তুমি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে না, তোমার মন্ত্রশিক্ষা হইবে ব্যর্থ।

প্রত্যুত্তরে কচ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—বেদবিরুদ্ধ ঐ প্রকার অধর্মাচরণে তথাপি আমি অক্ষম। তোমার এই অব্রাহ্মণসুলভ অভিশাপের জন্য আমিও তোমাকে অভিশাপ দিতেছি—কোন ব্রাহ্মণই তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না, তোমার বিবাহ হইবে ক্ষত্রিয়কুলে!

অভিশাপ এবং প্রত্যাভিশাপের পরে উভয়েরই ক্রোধ ক্রমশ শান্ত হইল।

প্রশমিত কণ্ঠে দেবযানী বলিল,—তবে যাও ভ্রাতা, সমগ্র দেবকুল তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। দিনান্তে একবার অন্তত এই হতভাগিনী ভগিনীকে স্মরণ করিও। অভিশাপ প্রত্যাহারের সাধ্য আমার নাই; তবে জানাইতেছি যে, নিজ অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করিতে না পারিলেও যাহাকে শিখাইবে সে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে। বিদায় ভ্রাতা—তোমার যাত্রা শুভ হউক।

অতঃপর কচ স্বর্গপথে যাত্রা করিল। দেবযানীকে প্রদত্ত অভিশাপ সে প্রত্যাহার করিল না। দেবযানীও প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা করিল না। পূর্ণ বিকশিত প্রথম প্রেমের চরম পরাজয়ের গ্লানিতে অবিরল অশ্রুধারায় দেবযানীর কপোল প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্তর হইতে তাহার বাহির হইল গভীর এক দীর্ঘশ্বাস।



কেতকী ও নরঋষি

অসামান্যা সুন্দরী তাপসী কেতকী। বয়স ত্রিংশ উত্তীর্ণ। অদ্যাবধি সে অবিবাহিতা। সে জাতিস্মরা। পূর্বের দুই জন্মের সকরুণ ইতিহাস তাহার স্মরণে আছে।.........

প্রথম জন্মে সে ছিল এক ঋষিকন্যা।

বাল্যকাল হইতেই তপশ্চারণ, বেদ-বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি নানা বিদ্যা অধ্যয়ন এবং আয়ত্ব করিয়া ঋষিসমাজে অদ্বিতীয়া বিদুষী হইয়া উঠিল। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়, কিন্তু তবুও কোন বিবাহযোগ্য পাত্র তাহার সম্মুখীন হইল না। তাহার সুললিত কণ্ঠে বেদগান, অধ্যয়নাগারে সর্ববিদ্যায় নিপুণতা দেখিয়া ঋষিযুবকেরা তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতে লাগিল—হীনমন্যতা ভাবাপন্ন হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বিমুখ হইল। পিতা কর্তৃক বিবাহের সর্বপ্রকার চেষ্টাও বিফল হইল। অতি বিদুষীর এই পরিণাম হইতে পারে—পূর্বে কেহ ইহা অনুমান করিতে পারে নাই। শেষে তাহার যৌবন উত্তীর্ণ হইল।

ক্ষোভে দুঃখে একদিন ঋষিকন্যা গৃহত্যাগ করিল। সাধারণভাবে তাহার পতিলাভ হইবে না নিশ্চিত বুঝিয়াছিল সে। সুতরাং হিমালয় কন্দরে এক গুহায় বসিয়া মহাদেবের তপস্যায় রত হইল।

কঠোর তপস্যার ফলে মহাদেব আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—কন্যা, তোমার তপস্যায় আমি পরিতুষ্ট—বর প্রার্থনা কর।

ঋষিকন্যা সম্মুখে মহাদেবকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল,—পতিংদেহি-পতিংদেহি-পতিংদেহি-পতিংদেহি-পতিংদেহি।

মহাদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—তথাস্তু। তুমি পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করিয়াছ, তোমার পঞ্চস্বামী হইবে।

লজ্জিত হইয়া ঋষিকন্যা কহিল,—দেবাদিদেব! আপনাকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পাঁচবার 'পতিংদেহি' উচ্চারণ করিয়াছিলাম। পঞ্চস্বামী হইলে অধর্ম হইবে, আমি বারবণিতা তুল্য গণ্যা হইব। ক্ষমা করুন আমায়, এ বর নয়—অভিশাপ।

মহাদেব বলিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। যদি তুমি

ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামী লইয়া সতী সাধ্বীরূপে পরিচিতা হইতে চাও তবে তোমাকে কঠোর তপস্যা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। তিন জন্ম তপস্যার পরে চতুর্থ জন্মে তোমার এই ভুবনখ্যাত ইন্দ্রতুল্য রূপবান গুণবান পঞ্চস্বামী হইবে। বল এখন—কি প্রার্থনা কর।

কেতকী মস্তক নত করিয়া বলিল,—সেই ভাল, আমি তিন জন্ম কুমারী থাকিয়া তপস্যা করিব, ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামীই আমি চাই।

তথাস্তু—তুমি জাতিস্মরা হইবে। বরদান করিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

বহুক্ষণ ঋষিকন্যা বেদনার্ত হৃদয়ে উপবিষ্ট রহিল। তিন জন্ম পতিলাভ হইবে না, বর প্রার্থনায় ত্রুটি ধরিয়া মহাদেবের এ এক অদ্ভুত বরদান, না এ অভিশাপ? তপস্যা, বিদ্যা ও যোগবল হইতে উদ্ভূত শক্তি সবই বিফল হইল! শেষে জাহ্নবী জলে দেহত্যাগ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল ঋষিকন্যা।

ঋষিকন্যার পুনর্জন্ম হইল কাশীরাজ গৃহে রাজকন্যা রূপে। পূর্বজন্মের তপস্যার পুণ্যফলে পরম ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের ভিতরে বাস করিয়াও বিদ্যা এবং তপশ্চারণের অভ্যাস সে ত্যাগ করিতে পারিল না। পূর্বজন্মের স্মৃতির সহিত মহাদেবের অদ্ভুত বরদানের কথা প্রায়শই স্মরণ হইত তাহার। সে জানিত—এই জন্মেও বিবাহ হইবে না তাহার।

কাশীরাজ কন্যার বিবাহের সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। কন্যা যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইল। পরিজনেরা তাহাকে অবজ্ঞা এবং করুণার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। শেষে একদিন গৃহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নির্জন গুহায় তপস্যায় রত হইল এবং বার্দ্ধক্যে যোগবলে দেহত্যাগে ব্যর্থ জীবনের পরিসমাপ্তি হইল তাহার।

কেতকী জানিত এইবার তাহার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ কুমারী জীবনের পরিসমাপ্তি কাল। বিষণ্ন মনে প্রায়ই সে ভাবিতে থাকে ভবানীপতির অদ্ভুত বরদানের কথা। জন্ম জন্ম এ প্রতীক্ষা, ত্রিভুবনে কোন দৃষ্টান্ত ইহার নাই। সে তপস্যা ও ব্রতচারণ দ্বারা এ জীবনও কাটাইবে—নিজের আত্মাকে পরম বিকাশের পথে লইয়া যাইবে যাহাতে পরজন্মে সুখী হয়।

একদিন এ জন্মের পিতাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল এবং তাহার অনুমতি লইয়া হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে তপস্যায় ব্রতী হইল। সর্বশেষে একদিন জাহ্নবীজলে দেহত্যাগ করিয়া এই জন্মের জ্বালা জুড়াইবে স্থির করিল।

বিমনা হইয়া কেতকী তপস্যাস্থল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দিক-ভ্রান্তের মত বিদীর্ণ হৃদয়ে পর্বতগাত্র বাহিয়া চলিতে লাগিল। পার্শ্ব দিয়া পুণ্যতোয়া গিরিদরী-বিহারিণী জাহ্নবী প্রবাহিতা। জাহ্নবীর স্বচ্ছ সলিলে জীবন বিসর্জন দিবে কিনা চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার দৃষ্টিপথে দৃশ্যমান হইল অদূরের এক পুষ্পিত বৃক্ষতলে পরমসুন্দর জ্যোতির্ময় এক পুরুষ জনৈকা অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী রমণীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় রত। এইরূপ জনবিরল স্থানে ঐ দুইজনকে ক্রীড়ারত দেখিয়া কেতকীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। উহারা কোথা হইতে এইস্থানে আসিল? উহাদের সর্বাঙ্গের ঐ জ্যোতির্ময় বিভা ইতিপূর্বে কোনদিন সে দেখে নাই। পুরুষটির মস্তক হইতে এক অপূর্ব দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া গগনতল আলোকিত করিতেছে।

স্তম্ভিত কেতকী ধীরে ধীরে উহাদের নিকটবর্তী হইলে দিব্যপুরুষ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন,—কেতকী, তোমার বিধিলিপি আমি জানি। তোমার কাম্য অদ্যই দেখিতে পাইবে—জীবন বিসর্জন দিও না। জাহ্নবী তটে ক্ষণিক বিশ্রাম কর। যদি কেহ আসিয়া তোমাকে ত্যক্ত বা কুপ্রস্তাব করে তবে তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে—মা ভৈ।

দ্যুতিমান পুরুষ ও রমণী পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় রত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কেতকী স্থানত্যাগ করিল। অদূরে কুলুধ্বনিতে প্রবাহিতা মন্দাকিনী জাহ্নবী। জাহ্নবী তটে সে বসিল! প্রবাহিনীর নির্মল সলিলে সে তাহার স্বমুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—যৌবন অটুট আছে। এতদিনের তপস্যার তপপ্রভাবে দেহের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবন বিসর্জন দিতে দিব্যকান্তি মহাপুরুষ নিষেধ করিলেন, কিন্তু এ কী প্রহেলিকাময় তাহার বাণী—'তোমার কাম্য অদ্যই দেখিতে পাইবে।' এই প্রহেলিকাময় কথার রহস্য ভেদ করিতে পারিল না সে। তাহার নয়ন হইতে হৃদয়মথিত অশ্রু ঝরিয়া বিন্দু বিন্দু রূপে প্রবহমান জাহ্নবীর সলিলে পতিত হইতে লাগিল।

সেইসময় অদূরে নৈমিষ্যারণ্যে দেবগণ বিশ্বযজ্ঞে সমবেত হইয়াছিলেন। যজ্ঞের হোতা স্বয়ং ধর্মরাজ যম। নির্বিঘ্নে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী

অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের সমাপ্তি হইয়াছে। দেবকুল প্রত্যাগমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন. এমন সময় সকলে দেখিলেন স্রোতস্বিনী পুণ্যতোয়ায় একটি একটি করিয়া অপূর্ব সুষমামণ্ডিত কনকপদ্ম ভাসিয়া আসিতেছে।

বিস্মিত দেবরাজ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং পবনদেবকে পূর্বাপর ঐ বিস্ময়কর কনকপদ্মের উৎসসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহারা ফিরিলেন না দেখিয়া দেবরাজ শেষে ধর্মরাজকে একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। ধর্মরাজও ফিরিলেন না। তখন উদ্বিগ্ন দেবরাজ স্বয়ং ঐ কনকপদ্মের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পবনদেব এবং ধর্মরাজ কেতকীর সান্নিধ্যে গিয়া যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহা দেবরাজ জানিতে পারেন নাই।

কিছুদূর গিয়া দেবরাজ দেখিলেন এক অসামান্যা সুন্দরী ক্রন্দনরতা যুবতী জাহ্নবীতটে বসিয়া আছে এবং তাহার অশ্রু বিন্দু বিন্দু রূপে নদীজলে পতিত হইতেছে এবং কনকপদ্মে রূপান্তরিত হইয়া স্রোতমুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র এই নির্জনে অপরূপ লাবণ্যময়ী ঐ যুবতীকে দেখিয়া কামমোহিত হইলেন। তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি যুবতীর নিকটবর্তী হইয়া কহিলেন,—কে তুমি ভদ্রে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আমাকে ভজনা করিলে তোমার সর্বদুঃখ নিরসন করিব।

এই বলিয়া তিনি কেতকীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

কেতকী বলিল,—দেবরাজ! আমাকে স্পর্শ করিবেন না। কিজন্য আমি ক্রন্দন করিতেছি তাহা জানিতে উৎসুক হইলে আমার সহিত কিছুদূর গমন করিলেই কারণ জানিতে পারিবেন।

দেবরাজ ঐকথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কেতকীর সহিত কিছুদূর গমন করিয়া অক্ষক্রীড়ারত জ্যোতির্ময় দম্পতীকে দেখিতে পাইলেন। দম্পতী ইন্দ্রকে একবার নিরীক্ষণ করিলেন মাত্র। পরমুহূর্তে ইন্দ্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অক্ষক্রীড়ায় রত হইলেন।

ইহাতে দেবরাজ নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন,—আমি সুরপতি ইন্দ্র। এই ভূমণ্ডল আমার অধীন এবং আমিই তোমাদের প্রভু। আমাকে সমুচিত সম্মান ও সৎকার না করিয়া অক্ষক্রীড়ায় তোমাদের প্রমত্ত থাকা অনুচিত এবং অমার্জনীয় অপরাধ।

এইরূপ দম্ভোক্তি শুনিয়া দিব্যপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া ইন্দ্রের দিকে

দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ইন্দ্রের সর্বশরীর বিবশ হইয়া গেল। দেহ স্থানুবৎ নিশ্চল হইয়া গেল। গতিরুদ্ধ হইল তাহার।

তখন সেই দিব্যপুরুষ ক্রন্দনরতা কেতকীকে পূর্বের মতই বলিলেন, ঐ হীনবল ইন্দ্রকে হস্তধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর।

কেতকী নিজের দক্ষিণ হস্তে ইন্দ্রের বামপানি ধারণ করিতেই ইন্দ্রের দেহের সর্ববল অপহৃত হইল। শুধু তাহার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হইল,—আপনি কে মহাত্মন ?

দিব্যপুরুষ হাসিয়া কহিলেন,—সম্মুখের ঐ প্রস্তরখণ্ড অপসারণ কর, হৃতশক্তি পুনরায় তোমাকে দান করিতেছি। প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলে একটি গুহামুখ দেখিতে পাইবে, সেই গুহায় তুমি প্রবেশ কর।

দেবরাজ সম্মোহিতের মত আদেশ পালন করিলেন এবং অদূরবর্তী গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পবনদেব এবং ধর্মরাজ ঐ গুহায় বন্দী হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিব্যপুরুষ উহাদের নিকট আসিয়া হাস্যমুখে কেতকীকে বলিলেন,—এই পঞ্চজনকেই তুমি তোমার দক্ষিণহস্ত দিয়া ইহাদের বাম করতল ধারণ করিয়াছ, পানিগ্রহণ হেতু এই পঞ্চজনই তোমার স্বামী হইবার অধিকারী। এখন বল কাহাকে ভর্ত্তারূপে নির্বাচন করিবে ? এই বলিয়া কেতকীকে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় দিলেন।

কেতকী তথাপি ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া অক্ষক্রীড়ারতা দিব্য-পুরুষের সঙ্গিনী রমণী কহিলেন,—ভগবান ভূতভাবন! কেতকী দ্বিধাগ্রস্ত, ঐ পঞ্চজনকেই কেতকীর সম্মুখে সারিবদ্ধ হইতে আদেশ করুন। উহাদের মধ্য হইতে কেতকী তাহার পতি নির্বাচন করুক।

পঞ্চদেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেতকী কোনরূপ মনস্থির করিতে পারিল না। স্তব্ধ হইয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দিব্যপুরুষরূপী ভগবান তাহার মনোবাসনা বুঝিয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন,—তুমি সকলকে সমরূপে অপরূপ দেখিতেছ, পঞ্চজনকেই স্বামীরূপে চাহিতেছ। তবে তাহাই হউক—এই পঞ্চজনই তোমার পতি হইবে।

এইবার মহাদেব ও পার্বতী স্বরূপে নিজেদের দর্শন করাইলেন। ভগবান ভূতভাবনকে দেখিয়া দেবতাগণ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেবাদিদেব কহিলেন,—তোমরা পঞ্চদেবতাই নির্জনে একাকী এই

ভামিনীকে দেখিয়া কামমোহিত হইয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে, সেই কর্মফলে তোমরা পঞ্চজনই ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্জন্মপ্রাপ্ত এই কেতকীকে পত্নীরূপে লাভ করিবে। দেহত্যাগের পরে তোমাদের আত্মা স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিবে।

দুঃখশোকপূর্ণ নরলোকে জন্মগ্রহণ!—এই দারুণ আদেশে দেবগণ ভীত হইয়া মহাদেবের নিকট কৃতকর্মের জন্য বারংবার মার্জনা ভিক্ষা করিলে মহাদেব প্রসন্ন হইলেন।

বলিলেন,—তোমরা স্বয়ং নরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে না চাও তবে তোমাদের পঞ্চপুত্রের জনক হইতে হইবে। ইন্দ্রসহ অপর চারিজন দেবতা নিজ নিজ কর্মফলের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ না হইলেও ইহাদের পুত্রেরা পরলোকে যাইবে। পুত্র-আত্মার প্রতিভূ। উহাদের মধ্যে দেবরাজ অদিতি নন্দন বাসবের পুত্র হইবে সকল পুত্রগণের মধ্যে রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ। এই পঞ্চপুত্রই হইবে পরজন্মে কেতকীর পঞ্চস্বামী।

দেবগণ প্রস্থান করিলে জিজ্ঞাসুনেত্রে পার্বতী বলিলেন,—প্রভু! আপনার আদেশের মর্মার্থ বুঝিলাম না। পঞ্চ দেবতার পুত্রগণের মধ্যে দেবরাজ বাসবের পুত্র কে হইবে? কে হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ? কন্যা কেতকী কাহার কণ্ঠে প্রথমে বরমাল্য দান করিবে?

দেবাদিদেব হাসিয়া কহিলেন,—তোমরা দুইজনে আমার সহিত বদরীকাশ্রমে গমন কর। সেইস্থানে তোমরা নারায়ণ ও নরঋষিকে দেখিতে পাইবে।

দুই ঋষি বদরীকাশ্রমে তপস্যারত। অদ্ভুত তাহাদের তপস্যারীতি। সম্মুখে তূণীরপূর্ণ শর—উর্দ্ধে শরজাল বিস্তৃত করিয়া চতুর্দিক আবরিত।

দেবাদিদেব বলিলেন,—যাঁহার মস্তকের উর্দ্ধে জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যাইতেছে তাঁহার নাম নারায়ণ। তিনি গোলকপতি নারায়ণের অংশ-সম্ভূত এবং ঐশী শক্তির অধিকারী—দেবগণের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং সর্বগুণান্বিত। অপরজন—শরজালে যাহার চতুর্দিক আবৃত রহিয়াছে—তিনি নরঋষি। নারায়ণ-ঋষি নিজের একাকীত্ব দূরীকরণের জন্য নিজের দেহ হইতে ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা পরস্পর অনন্ত সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। ইহার তুল্য রূপবান সুঠাম দেহধারী জিতেন্দ্রীয় পুরুষ নরলোকে নাই। নারায়ণ ইহাকে দেবজীবনের সমগ্র সত্বগুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

দেবাদিদেবের সহিত পার্বতী ও কেতকীকে আসিতে দেখিয়া দুই তাপস তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। সকল কথা শ্রবণ করিয়া নারায়ণ-ঋষি নরের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন—নরঋষি কেতকীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, কেতকীও নরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে—উভয়েরই দৃষ্টি প্রণয়রঞ্জিত—হৃদয়ের আকুলতা পূর্ণরূপে প্রকাশিত, মনোগত বাসনা মুখমণ্ডলে প্রতিভাত।

দেবাদিদেবের অভিপ্রেত অনুসারে নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন,—সখা নরঋষি, পরজন্মে তোমাকেই হইতে হইবে কেতকীর প্রথম পতি। তুমি দেহত্যাগ করিয়া কুরুবংশ অবতংশ পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গর্ভে ইন্দ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিবে—হইবে অমিতবীর্যশালী এবং রূপেগুণে আদর্শ পুরুষ। এই কেতকী দেহত্যাগ করিয়া দ্রুপদরাজার কন্যারূপে যজ্ঞানল হইতে জন্ম লইবে। মাতৃজঠরে থাকিবার ক্লেশ কেতকীকে সহ্য করিতে হইবে না। দেবাদিদেবের বিধানে কেতকীর পঞ্চস্বামীর মধ্যে তুমিই প্রধান হইবে।

কাতরকণ্ঠে নরঋষি বলিলেন,—সখা, তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ অসহ্য, আমি বিচ্ছেদ চাহিনা, চাহিনা তবে কেতকীকে—

উচ্চহাস্যে নারায়ণ-ঋষি কহিলেন,—জানি সখা জানি, আমিও ধরাতলে সেই সময়ে দেবকীর গর্ভে জন্ম লইব। হইব তোমার চিরসখা—পার্থসারথী।

ইহা শুনিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল নরঋষি। কেতকীর হস্তধারণ করিয়া বলিল,—এই জন্মে তোমাকে পাইলাম না কেতকী, কথা দাও পরজন্মে যেন তোমাকে পাই।

উদ্বেলিত আনন্দে কেতকী মুখ নত করিল। অস্ফুটস্বরে বলিল,—তোমার কণ্ঠেই দিব আমার প্রথম বরমালা।



গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শেষে বিজয়ী যুধিষ্ঠির যেন মহাশ্মশানের উপরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। শতপুত্রহারা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের হাহাকার, স্বামীহারা-পিতৃহারা শত সহস্র নারী ও শিশুর ক্রন্দন, স্বামীহারা উত্তরার অবিরল অশ্রুপাত যুধিষ্ঠিরের সকল বিজয়আনন্দ বিষণ্ণতায় পরিবেষ্টিত করিল।

ন্যায়-অন্যায় সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা—এই দশজন মাত্র রক্ষা পাইল। দুর্যোধনাদি শতভ্রাতা এবং তাহাদের সকল পুত্রেরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে—কৌরবপক্ষ নির্বংশ। একমাত্র রক্ষা পাইয়াছে বৈশ্যাগর্ভে জাত ধৃতরাষ্ট্রের কানীনপুত্র যুযুৎসু।

যুযুৎসু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে পাণ্ডবশিবিরে ছিল বলিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। যুদ্ধশেষে সে হস্তিনাপুরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও পৌত্রদের শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিল।

মহাসমরের শেষদিনের পূর্বের নিশীথ রাত্রে পাণ্ডবদের স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়া অশ্বত্থামা পাণ্ডবভ্রমে খড়্গাঘাতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতবর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেনের মুণ্ডচ্ছেদ করিল। পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ স্ত্রী দেবীকা, বলন্ধরা, সুভদ্রা, করেনুমতী ও বিজয়া তাহাদের পঞ্চপুত্র যৌধেয়, সর্বগ, অভিমন্যু, নিরামিত্র ও সুহোত্রকে যুদ্ধে প্রায় কিশোর বয়সেই হারাইয়াছে। নিহত হইয়াছে উলূপীর গর্ভজাত অর্জুনপুত্র ইলাবন্ত এবং ভীমপুত্র ঘটোৎকচ। অর্জুনের অপরপুত্র বভ্রুবাহন যুদ্ধে যোগদান না করিয়া মনিপুরে থাকিবার ফলে জীবিত রহিল। কিন্তু সে পাণ্ডববংশজ নয়—তাহার কথা সকলে বিস্মৃত হইয়াছিল। আর জীবিত রহিল অর্জুনের পৌত্র উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিৎ।

আত্মীয়স্বজন নিধনের মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞশেষে রাজকার্য্যে এবং বিদুরের সহিত ধর্মালোচনায় রত হইলেন। কিন্তু—

অন্তঃপুরে শুধু হাহাকার—বিলাপ—ক্রন্দন। ধৃতরাষ্ট্র অধীর হইয়া উঠিলেন। শোকবিদ্ধস্ত অন্ধজীবনের কোন প্রয়োজনই আর নাই।

তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কোন অরণ্যে তপোবন নির্মাণ করিয়া বাস করিবেন এবং তপশ্চারণ ও ঈশ্বরচিন্তা করিয়া বাকী জীবন অতিবাহিত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিলেন।

বনগমনের পূর্বে কুন্তী তাহার সমগ্র আত্মীয়স্বজন এবং পুত্রবধূদের শেষ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সংবাদ পাইয়া মনিপুর হইতে চিত্রাঙ্গদা এবং নাগলোক হইতে উলূপী আসিল। ভীমপত্নী রক্ষবধূ হিড়িম্বার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, হয়তো পুত্রশোকে হিড়িম্বা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহাদের জন্য গঙ্গাতীরে বিজন অরণ্যে তপোবন নির্মাণ করিয়া দিলেন। ইহা ব্যতিরেকে তাহারা অন্য কোন সাহায্য লইলেন না। অরণ্যে অজস্র ফলবান বৃক্ষ ছিল। ফলমূল আহার এবং ঈশ্বর আরাধনা করিয়া কাল কাটাইবেন স্থির করিলেন। জীবন বিসর্জন করিবার ইচ্ছাও তাঁহারা প্রকাশ করিলেন। বানপ্রস্থে যাইবার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

তপোবনে তপশ্চারণ এবং বিদুরের সহিত ধর্মালোচনায় ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে কিছুটা শান্তি আসিল। কিছুকাল পরে ধর্মাত্মা বিদুর দেহত্যাগ করিলেন। অধীর ধৃতরাষ্ট্র ইহার পরে দেহত্যাগের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধর্মালোচনা বন্ধ হইয়াছে—এক্ষণে জীবন আরও মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। অর্ধাহার-অনাহার-কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সকলে আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতে লাগিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে সহসা সমগ্র বনভূমি বিভিন্ন পশুপক্ষীর আর্তনাদে মুখরিত হইল। সঞ্জয় ছুটিয়া আসিলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, স্বেচ্ছান্ধ গান্ধারী, শীর্ণকায়া কুন্তী—তাঁহারা প্রায় চলৎশক্তিহীন।

তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সঞ্জয় আর্তনাদ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! সমগ্র বনাঞ্চল দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, ভয়াল অগ্নি ভৈরব গর্জনে দ্রুত নিকটবর্তী হইতেছে, এখনও পলায়নের পথ আছে, কিন্তু আপনারা অশক্ত বৃদ্ধবৃদ্ধা—কৃচ্ছ্রসাধনে দুর্বল। আসুন, আমি মহারাজের হস্তধারণ করি, মাতা কুন্তী গান্ধারী মাতার হস্তধারণ করুন, চেষ্টা করিয়া দেখি দাবানল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব কিনা।

সহসা মহাউল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, বলিলেন,—আমি দেখিতেছি, সকল কিছুই দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি স্বেচ্ছান্ধ দেবী গান্ধারীকে, দেখিতেছি আর্যা কুন্তীকে, চিরসখা সঞ্জয়—তোমাকেও দেখিতে পাইতেছি। পিতা বেদব্যাস বরদান করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পূর্বে আমি দিব্যদৃষ্টি পাইব, সকল কিছুই দেখিতে পাইব। সবই দেখিতেছি আমি। আমার মৃত্যু আসন্ন—এই মৃত্যুকে সানন্দে বরণ করিতে চাই। দেবী গান্ধারী, তোমার চক্ষুর আবরণ উন্মোচন কর, একবার দেখিয়া লই আমার চিরসঙ্গিনীর মুখমণ্ডল, তুমিও নিরীক্ষণ কর তোমার চক্ষুষ্মান স্বামীকে, অমৃতলোক যাত্রার পূর্বে পৃথিবীকে একবার প্রাণভরিয়া অবলোকন কর।

গান্ধারী তাঁহার চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিলেন। জীবনে প্রথম দেখিলেন নিজ স্বামীর মুখমণ্ডল, আর্যা কুন্তী এবং সূতনন্দন সঞ্জয়কে। বক্ষস্থল হইতে বাহির হইল গভীর দীর্ঘশ্বাস। নয়নে নামিল অশ্রুধারা।

ওদিকে গর্জন করিয়া ভয়াল মৃত্যু অগ্রসর হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—দেবী গান্ধারী! আর্যা কুন্তী—এই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ আমরা নিজেদের সঞ্চিত গুপ্তপাপ এবং আত্ম-প্রবঞ্চনা প্রকাশ করিতে পারি—পারিলে আমরা পাপমুক্ত হইব, অন্ততঃ আমাদের হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে। আর্যা কুন্তী, প্রথমে নিজের গুপ্ত পাপ প্রকাশ কর—যদি কিছু সঞ্চিত থাকে।

ঐ কথায় ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন পাণ্ডবমাতা। বলিলেন,—এই মহাসমরে মহাশ্মশানে পরিণত হইবার জন্য আমিই দায়ী। কবচকুণ্ডল-ধারী অমিতবীর্য কর্ণ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সূর্যদেব তাহার জনক—আমার কন্যাকাবস্থায় তাহার জন্ম হইয়াছিল। লোকলজ্জার ভয়ে আমি মঞ্জুষায় করিয়া তাহাকে নদীবক্ষে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। সে আশ্রয় পাইয়াছিল সূত অধিরথ গৃহে—কৌন্তেয় হইয়াছিল রাধেয়, সূর্যপুত্র হইয়াছিল সূতপুত্র। রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষার দিনে তাহার দেহে কবচকুণ্ডল ও সহজাত রবিজ্যোতি দেখিয়া আমার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারি, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কিছু প্রকাশ করি নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষণে নদীতীরে তাহার সহিত একবার মিলিত হইয়াছিলাম এবং তাহাকে প্রকৃত পরিচয় দিয়া পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলাম। কর্ণ দুর্যোধনকে কিন্তু পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। শেষে কূটকৌশলে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি যে অর্জুন ছাড়া অপর চারি ভ্রাতাকে সে হত্যা করিবে না। মহামতি সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টিতে নিশ্চয় দেখিয়াছেন

যে কর্ণ চারি ভ্রাতাকেই পরাজিত করিয়া গলদেশে ধনুকের জ্যা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তাহাদের মুখচুম্বন করে এবং বধ না করিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। তাহার কারণ ইহাই—মাতার নিকটে কর্ণের প্রতিজ্ঞা পালন। ইহা ছাড়া আরও মহাপাপ হইয়াছে আমার—যাহা কর্ণকে বলিয়াছি তাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে পারি নাই অসীম সংকোচে। কর্ণ তাহাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির কর্ণের শরণ লইত। কর্ণ এবং দুর্যোধন পরস্পর পরম বন্ধু। অতএব হয়ত যুদ্ধ বন্ধ হইত—এই মহাশ্মশান হইত না। এই মহাপাপের জন্য আমিই দায়ী। অগ্নি-দহনে আমি পাপমুক্ত হইতে চাই।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এইবার কহিলেন,—এই মহাশ্মশান সৃষ্টির জন্য আমিই দায়ী আর্যা কুন্তী। আমার হৃদয়ে ছিল দুর্যোধনের প্রতি অসীম দুর্বলতা। তাহাকে কোনদিন চক্ষে দেখি নাই—উত্তমরূপে স্পর্শ পর্যন্ত করি নাই। তথাপি তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র অপূর্ব বাৎসল্যরসে হৃদয় পূর্ণ হইত। তাহার যে কোন আবেদন অন্যায় বুঝিলেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমি ভাবিতাম পাণ্ডবেরা পরাজিত হইলে দুর্যোধন হইবে ভারতের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ যাহার সহায়—সেই একাদশ অক্ষৌহিনী সেনাপতি দুর্যোধন যে সপ্ত অক্ষৌহিনী সৈন্যদল লইয়া সমাগত পাণ্ডবপক্ষের নিকট পরাজিত হইবে সেই ধারণা করি নাই। আমার ধারণা ছিল আমিই মহারাজ। দুর্যোধন আমার প্রতিভূমাত্র। আমি আদেশ দিলে এই যুদ্ধ বন্ধ হইত। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চাহে নাই—শেষ পর্যন্ত উহারা পঞ্চগ্রাম চাহিয়াছিল। আমি বন্ধ করি নাই যুদ্ধ—আমার শতপুত্র নাশ আমারই পাপে, আমারই কর্মফলে এই মহাশ্মশান হইয়াছে। এইবার বল গান্ধারী—কি তোমার সঞ্চিত পাপ?

গভীর কণ্ঠে গান্ধারী বলিলেন,—আর্যপুত্র! আমি কোন পাপা-চরণ কিংবা অধর্ম করি নাই—চিরদিন যথা ধর্ম তথা জয় উচ্চারণ করিয়াছি। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাকৃত কোন পাপ করিয়াছি কিনা আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। পুত্রেরা আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই—তাহার জন্য আমি দায়ী নই।

উচ্চহাস্য করিলেন দৃষ্টিবান ধৃতরাষ্ট্র। বলিলেন,—জান না গান্ধারী, তুমি কত বড় পাপী। আত্মপ্রবঞ্চনার চাইতে মহা পাপকার্য আর কি আছে!

আহত ও ব্যথিত কণ্ঠে গান্ধারী বলিলেন,—আত্মপ্রবঞ্চনা! আপনার এ কথার অর্থ বুঝিলাম না মহারাজ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—স্বামী-পুত্রদের প্রতি কর্তব্য পালন করাই প্রকৃত নারীধর্ম। নিজের চক্ষুকে আবদ্ধ, অর্থাৎ স্বেচ্ছান্ধ হইয়া নিজেকে পতিব্রতা বলিয়া প্রচার করিয়া আনন্দ লাভ করিতে—তুমি পতিব্রতা নও গান্ধারী। অন্ধ—নিঃসহায় স্বামী তোমার কাছে কোন সাহায্যই পায় নাই। উপরন্তু তুমি নিজেই হইয়াছিলে সংসারের ভারস্বরূপ। সর্বদা দাসী আমার হস্তধারণ করিয়া পরিচালিত করিত। ইহাকে পতিব্রতা বলে না গান্ধারী।

স্বামীর কথায় বিস্মিত গান্ধারী বলিলেন,—যদি আমার ভ্রান্তি হইয়া থাকে তবে কেন আপনি কোনদিন আমাকে চক্ষুবন্ধন মোচন করিতে আদেশ করেন নাই!

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ইহা এক পৈশাচিক আনন্দ গান্ধারী—অন্ততঃ আমার মত অপর অন্ধ আমার সহধর্মিনী তাহা জানিয়া নারকীয় আনন্দ লাভ করিতাম—বিবেক কোনদিন ইহাকে প্রকৃত সমর্থন করে নাই।

স্তম্ভিত হইলেন দেবী গান্ধারী। তিনি যাহার জন্য চিরকাল দুঃখবরণ করিয়াছেন—পৃথিবীর আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেকে অন্ধকারে রাখিয়াছিলেন, তিনি নিজেই এখন তীব্র সমালোচক?

স্খলিত স্বরে বলিলেন গান্ধারী,—বলুন প্রভু! আর কি আমার সঞ্চিত অপরাধ?

তীব্রস্বরে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্রদের মুখদর্শন কোনদিন কর নাই—কর নাই অমৃতরূপী স্তন্যদান—কর নাই মুখচুম্বন—মাতৃক্রোড়ে তাহাদের দাও নাই স্থান। চক্ষুবন্ধনে আবৃত হইয়া তাহাদের শুধু কণ্ঠস্বরে চিনিতে। মাতৃবাৎসল্যহীনা কেমন করিয়া পুত্রদের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবে? আর্যা কুন্তীকে দেখ—নিজ তিনটি সন্তান ছাড়াও দুইটি সপত্নীপুত্রকে পরমস্নেহে লালনপালন করিয়াছেন। তাহাদের বুঝিতে দেন নাই তিনি বিমাতা। কুন্তী মাতৃস্নেহে পুত্রদের বশীভূত করিয়াছেন। মাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্নেহ—গান্ধারী, তুমি তোমার পুত্রদের সেই সম্পদে চিরবঞ্চিত রাখিয়াছিলে। তোমার এই আচরণ কি মহাপাপ নয়?

ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন গান্ধারী। বলিলেন,—প্রভু, আমার এই ভ্রান্তি, আমার এই আত্মপ্রবঞ্চনা আমার নিকটে অজ্ঞাত ছিল—ভাবিতাম আমার মত সাধ্বী পতিব্রতা জগতে কেহ নাই। এখন বুঝিতেছি আমি শুধু আত্মপ্রবঞ্চিতা মহাপাপী—স্বামীপুত্রস্বজনদের প্রতি কোন কর্তব্যই পালন করি নাই। অজ্ঞানতাই আমাকে মহাপাপে নিমজ্জিত করিয়াছিল।

অগ্নি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দাবানলের তাপ দেহকে স্পর্শ করিতেছে। পশুপক্ষীর আতঙ্কিত আর্তনাদকে অতিক্রম করিয়া অগ্নি-শিখার গর্জন চতুর্দিকে মুখরিত করিতেছে।

উচ্চস্বরে বলিলেন ধৃতরাষ্ট্র,—আত্মদোষ কথনে আজ আমরা পরিশুদ্ধ, সম্ভবত পাপমুক্ত। সঞ্জয় তুমি পলায়ন কর—এখনও সময় আছে।

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার চিরসঙ্গী। সহমৃত্যু বিচ্ছেদ আনিতে পারিবে না। অগ্নি আমাদের অবিলম্বে গ্রাস করিবে। দেবী কুন্তী—ঈশ্বর স্মরণ করুন, দেবী গান্ধারী—আজ চক্ষুস্মান হইয়া শেষ ক্ষণে দৃষ্টিপ্রাপ্ত স্বামীর হস্ত ধারণ করুন। আজ আমাদের সকলের সহমরণ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—না সখা না। তোমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা পাইতেই হইবে। তুমি আত্মরক্ষা করিয়া যুধিষ্ঠির এবং পুত্র যুযুৎসুকে আমাদের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান কর। পারলৌকিক ক্রিয়া, জাহ্নবী সলিলে অস্থি দান, আত্মাকে পিণ্ডদান প্রভৃতি না করিলে আমাদের আত্মা মুক্তি পাইবে না—যাও বন্ধু যাও—মৃত্যুপথযাত্রীদের শেষ প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ একান্ত সঙ্গত মনে করিয়া সঞ্জয় অতিকষ্টে দাবানল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দ্রুত রাজধানীর দিকে পদচালনা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী নিজেদের পাপমুক্ত—ভারমুক্ত অনুভব করিলেন। দৃষ্টিপ্রাপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, চক্ষুষ্মান দেবী গান্ধারী ও স্থিরপ্রজ্ঞা দেবী কুন্তী পরস্পর মুখোমুখি হইয়া নিমীলিত নেত্রে যোগাসনে বসিলেন। হুহুঙ্কারে হুতাশন আসিয়া তাঁহাদের পরিবেষ্টিত করিল। তাঁহাদের একগাছি কেশও এই পরিবেশে কম্পিত হইল না। ইহা যে চিরশান্তিময় অমৃতলোক যাত্রার পরমকাম্য আহ্বান। ইহা দহন নহে—স্নেহের পরশ!
